"প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর
এইমাত্র যোগ,
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি
আনন্দের ভোগ ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ ।"

রবীন্দ্রনাথ

মুখবন্ধ

বাঙলা দেশেও অনেকে মনে করেন যে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা দেশে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আসলে কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁর মনীষা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বাঙলার বিদগ্ধ-সমাজকে চমৎকৃত করেছিল। কবি বিহারীলাল যেভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যালোচনা করতেন, রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়বর্গ, এমন কি স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে বালক কবিকে সম্মানিত করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে নিজের গলার মালা দিয়ে কিশোর কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, নবীনচন্দ্র তরুণ রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন—সে সব কথা মনে করলে এ ধারণা মুহূর্তের জন্যও টেঁকে না। বহুভাবে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন অবশ্য যুবক রবীন্দ্রনাথকে হতে হয়েছিল, কিন্তু নিন্দুক ও সমালোচকের আলোচনা ও আক্রমণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বীকৃতি ছিল সুস্পষ্ট। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথ যে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, পূর্বে কোনদিন কোন ভারতীয় সাহিত্যিকের ভাগ্যেই বোধ হয় তা লাভ করা সম্ভব হয়নি।

এ কথা অবশ্য নিঃসন্দেহ যে, পাশ্চাত্য দেশে স্বীকৃতি লাভের পরে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় খ্যাতিও বহুগুণ বেড়েছিল। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পরিচিত মানুষের মর্যাদা সব সময়ে আমরা উপলব্ধি করি না, কিন্তু দেশ-বিদেশে যখন পরিচিত মানুষ সম্মানিত হন, তখন তাঁর সে সম্মানে দেশের সমূহ লোকই সম্মানিত হয়ে থাকেন এবং সে সম্মানের অংশ গ্রহণ করেন। বহুকাল ভারতবর্ষ বাইরের পৃথিবীতে সমাদর লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করলেন, সমস্ত ভারতবাসীই তখন তাঁর সে সম্মানের অংশ গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশ-বিদেশে নানাভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বীকৃতির বিপুল আয়োজন হয়েছে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে বলে, কবি, সাহিত্যিক, সংগীতকার, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক ও ধর্মগুরু সকলেই সাগ্রহে এ সমারোহ-উৎসবে যোগদান করেছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে যে ভাবে

নিজেদের কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমাদর করেছেন, তাঁর যাথার্থ্য প্রকাশ করেছেন, এই উপলক্ষে তারই একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন বলে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। ভূমিকায় তিনি নিজের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কেবলমাত্র এই কথাই বলতে চাই যে, এই সংকলনের মধ্যে বাঙলার সাহিত্যিক ইতিহাসেরও একটি সংকেত মিলবে। যে অনুরাগ ও পরিশ্রমের সঙ্গে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এ কর্তব্য পালন করেছেন, তার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নয়া দিল্লি

হুমায়ুন কবির

প্রাক্‌কথন

'কবি-প্রণাম' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত কবিতা ও সংগীতের একটি সংকলন। কবির ভাস্বর প্রতিভাকে কেন্দ্র করে, কবির তিরোধানের পূর্বে ও পরে, কবির উদ্দেশে ও উদ্দেশ্যে যে সকল কবিতা ও সংগীত রচিত হয়েছে, উক্তরূপ শতাধিক কবিতা ও কিছুসংখ্যক সংগীত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ ধরনের সংকলনের সার্থকতা কি?

আজ দেশ-দেশান্তরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের সাধ্য-সাধনাকে আজ পুনর্বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্মরণ ও কার্যকর করার শুভলগ্ন আমাদের সমক্ষে সমুপস্থিত। এ হেন লগ্নে বাংলার প্রবীণ, নবীন ও নবীনতর কবিরা রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখতেন ও দেখে থাকেন তার একটা মূল্যায়ন করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে বলেই মনে হয়। এতদ্‌ব্যতীত কাব্য-সংস্কৃতির একটা পরম্পরার কথাও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রতি-বেশের প্রভাব এবং যুগধর্ম ব্যক্তির মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশিত হয়, তা চিরদিনই মানব-মনকে আকর্ষণ করে থাকে। ভাবের আদান-প্রদান ও তার প্রকাশ বিচিত্র গতিতে অগ্রস্থতি লাভ করে। এই অগ্রসরণের হিসাব-নিকাশ করতে হলে, সেই ভাবের যোগসূত্রের সন্ধান লাভের প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের পরিমাণ কিরূপ এবং আধুনিকতম কবিকুল রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তই বা কি পরিমাণে, এই সংকলনের বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে আমরা তার একটা মাপনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

কালের ইতিহাস বিচিত্র। অতীতের প্রতি আকর্ষণ, অতীত বিষয় ও ঘটনার মনন ও অনুরণন রোমান্টিক মনের ধর্ম। ভাবের দ্বান্দ্বিক চক্রে, কল্পনার অবগাহনে অতীতের প্রভাব কোন-না-কোন ভাবে মনের উপর সঞ্চারিত হয়, মন-মানসে ছাপ ফেলে। ভাবের স্তরে এই প্রভাবের সূত্র ধরেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করি। তথা-কথিত কালিক বর্তমানের ব্যবহারিক মূল্য স্বীকৃত হলেও, অনুভূতির স্তরে ইহার তাত্ত্বিক মূল্য কতখানি তা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। সাহিত্যে 'বর্তমান',

'আধুনিকতা', 'তথ্যবহুল' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অধুনা প্রায়শই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু এই শব্দগুলির যথার্থতা কি, এগুলির মধ্যে কোন সারবস্তু বিদ্যমান কিনা তারও বিচারের প্রয়োজন আছে। বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই আধুনিক পদবাচ্য কবিদের রচিত। প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের কবিতাও আছে অল্পসংখ্যক। কিন্তু এই অধিক সংখ্যক ইদানীন্তন কালের কবিদের কবিতাগুলি তথাকথিত আধুনিকতাশ্লিষ্ট কতখানি, তা এই কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে অনুভূত হবে। বহুজন এরূপ ধারণায় আস্থাশীল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীব্যাপী এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে, নূতন চিন্তা-ধারার প্রবাহ এসেছে, এবং সে পরিবেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ সম্বন্ধে মদ্দেশীয় মদোদ্ধত কোন এক লেখক এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি যে, "বাঙ্গালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে, তিনি বাংলায় বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন··· এ কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।" রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হয়ে কোন আধুনিক কবি সত্যই কোন মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা, সংকলনের বিভিন্ন কবিতাসকল আলোচনা করলে তারও একটা প্রত্যক্ষ ধারণায় উপনীত হবেন পাঠক।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থখানি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ 'বন্দনা', দ্বিতীয় 'সংগীত' ও তৃতীয় 'বিলাপ'। প্রথম 'বন্দনা' অংশে কবির জন্মদিন, কীর্তির বৈশিষ্ট্য ও রচনা প্রভৃতির মাধুর্য স্মরণ করে, বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। কোন পূজা বা উপাসনায় শ্রদ্ধার ভাবই প্রধান। শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে বাহ্য উপচার ও আন্তর-সামর্থ্য ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়। কেহ বা রাজসিকভাবে পূজা করে থাকেন, কেহ বা সামান্য পুষ্পার্ঘ্যেই তাঁর কার্য সমাধা করেন, আবার কেহ বা শূন্য হাতে প্রণতি জানিয়েই ক্ষান্ত হন—মূলতঃ, কে কতটা হৃদয় দিতে পেরেছেন সেখানেই পূজার সার্থকতা।

দ্বিতীয় 'সংগীত' অংশে কবিরই রচিত সংগীতের ধারা অনুসরণ করে, গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার আয়োজন হয়েছে। শেষ 'বিলাপ' অংশে কবির মৃত্যুদিন

বাইশে শ্রাবণকে কেন্দ্র করে, অথবা কবির তিরোধানে অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলী কবির উদ্দেশে তাঁদের বেদনাপ্লুত হৃদয়ের যে প্রকাশ কাব্যের মাধ্যমে নিবেদন করেছেন, সেই ধরনের কবিতাগুলিই স্থানগ্রহণ করেছে।

রসানুভূতির দিক থেকে এবং কাব্য-বিজ্ঞানসম্মত বিচারে বর্তমান সংকলনটি থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান প্রবহমান ভাবের উৎস অতীতের কোন একটি সূত্র থেকে উৎসারিত হয়ে এগিয়ে এসেছে। অতীতের ভাবরাজ্যে যা ছিল অন্তর্নিহিত, বর্তমান ঘটনার চাপে তার অধিকাংশই আজ মূর্ত হয়েছে। কবির মানবধর্ম ও মানবতাবোধ, তাঁর রোমান্টিসিজিম, যৌবনের উচ্ছ্বাস, দুর্দমনীয় গতিবেগ, রহস্য ও আধ্যাত্মিকতা, সাধ্য ও সাধনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা—সবই আজ কোন-না-কোন ভাবে বা রূপে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। কবিগুরুর বহুমুখী প্রতিভার প্রভাব আমাদের ভাবরাজ্যে যে এক নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করেছে একথা আজ স্বীকার না করে আর উপায় নেই। কবি নিজে তাঁর রচনার মধ্যে একস্থানে বলেছেন, "মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে, তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছন-হারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে তা কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।" তাই রবীন্দ্রনাথের সম্যক আলোচনায় দেখা যায়, সেখানে আছে প্রাচীন ঔপনিষদিক ঋষিদের জ্ঞান, বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসবোধ এবং কবি কালিদাস ও ভবভূতির প্রভাব। সাংস্কৃতিক পরম্পরার সূত্র ধরে মানুষ অতীতের সন্ধান পায় এবং যুগ-জীবনের একটি পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মে। এই আত্মীয়তা বা সহৃদয়তার মধ্যে দিয়েই আমরা আত্মার সন্ধান লাভ করি। সুতরাং ভাবের সংস্কৃতির পরম্পরার দিক থেকেও এ-জাতীয় সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও প্রকাশভঙ্গী পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নিহিত আছে। বর্তমান সংকলনে প্রায়-সমকালীন এমন অনেক প্রবীণ, নবীন ও অপেক্ষাকৃত নবীনতর কবিদের রচিত কবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে। জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, দেশ ও কালের এই পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতাগুলির ভাব, ধ্বনি ও বাচনভঙ্গী বহুল পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ কবিতারই অন্তর্নিহিত প্রভাব রাবীন্দ্রিক।

কোন স্রষ্টাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হলে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। রবীন্দ্রনাথকেও এ-জাতীয় বহু অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতের সংরক্ষণশীল প্রাচীন সমাজভুক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কবির জীবনদর্শন ও প্রকাশ-ভঙ্গীকে বহুদিন স্বীকার করেন নি। তাঁদের কাছে কবির রচনা বহুদিন একপ্রকার অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। রাজনৈতিক দলাদলি, ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি নানাপ্রকার একদেশদর্শিতার জন্য কবিকে বহুক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুঞ্জয়ী কাল কবির কণ্ঠে তাঁর অমূল্য বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন। দিকে দিকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আজ ধ্বনিত হয়েছে কবির জয়গান। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই আজ রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তির উৎসবে মুখরিত। এই উৎসবেরই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে অকিঞ্চিৎকর আয়োজন এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ। এর মধ্যে দিয়েই আমরা কবিকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়েই কবির সঙ্গে আমাদের আন্তর-যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করেছেন সংখ্যাতীত। 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর ন্যায় জাতীয় সংগীত থেকে আরম্ভ করে নানা সুরের স্বরধ্বনি, মিশ্রণ-সংমিশ্রণের ফলে নূতন সুরসৃষ্টির অপূর্ব ঝংকারে ঝংকৃত তাঁর সংগীতগুলি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করে গিয়েছে। এই সুরকার কবি ও সংগীতস্রষ্টাকে উপলক্ষ করেও অধুনা কিছু সংগীত রচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-প্রভাব ও রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য এই সংগীতগুলিতেও লক্ষণীয়। এযাবৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কবির স্বরচিত সংগীতগুলিই গীত হয়ে থাকে, কিন্তু আলোচিত সংকলনের অন্তর্গত আধুনিক কবি ও সংগীত-রচয়িতাদের রচিত কবি-সম্পর্কীয় সংগীতগুলি বর্তমানে এই উপলক্ষে গীত হয়ে, কবির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনে অধিকতর সাহায্য করবে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে কিছু কথন-আলাপন সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতীয় সংগীতের মূল রস হ'ল নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বরস। কিন্তু বিশেষকে নিয়েই হ'ল আর্ট। বিশেষ মনোভাব, বিশেষ হৃদয়াবেগ ও বিশেষ অনুভূতির প্রকাশই হ'ল আর্টের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের রচিত সংগীতাংশে এই বিশেষের একটি বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্র-সংগীতের মূল ধর্ম হ'ল নৈর্ব্যক্তিক ভূমিতে ব্যক্তিক অনুভূতি। ফলে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত কেবলমাত্র সুরের জন্যই

নয়, ভাবের জন্যও স্বরের সংমিশ্রণের প্রয়োজন হয়েছে। দরবারী বা উচ্চাঙ্গ মার্গ সংগীতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যথা—কথা ও স্বরের মধ্যে সংগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তথা—রবীন্দ্রনাথের গানে স্বরের রস ও শব্দের রস একীভূত হয়ে এক অপরূপ, অভূতপূর্ব আস্বাদন দান করে।

রবীন্দ্রনাথের স্বরসৃষ্টিতেও আছে এক অনবদ্য অভিনবত্ব। রূপের অখণ্ড ও সামগ্রিক অনুভূতি, শ্রুতির উপলব্ধি ও মূর্ছনার জ্ঞান,—এই ত্রিবিধ বিষয়ই নূতন স্বরসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যেরই এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

বাংলা কবিতায় ছন্দের অসাড়তা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পয়ারের রাজত্বে যুগ্মবর্ণকে তিনি দু'মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে, শব্দের অন্তস্থিত ফাঁকটুকু ধ্বনিতে যেমন বিস্তারিত হয়েছে, তেমনি নানা ছন্দের প্রবর্তন করে কবিতার স্বর-দেহকে তিনি বহু-বৈচিত্র্যের মধ্যে নূতন করে সাজিয়েছেন।

বর্তমান সংকলনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি সম্পর্কে যৎসামান্যই উল্লেখিত হ'ল মাত্র। কিন্তু কবিগুরু সম্বন্ধে যত কিছুই বলা হোক না কেন, যে ভাবেই বলা হোক না কেন, তাঁর বিরাট সমগ্রতাকে সম্পূর্ণভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁর অভ্রভেদী প্রতিভা, গগনচুম্বী যশরাশি, বাইরের ঐশ্বর্য ও অধ্যাত্ম অনুভূতির পশ্চাতে কোথায় যেন এক অনির্বচনীয় রহস্য লুকিয়ে আছে—একটি প্রশ্ন তাঁর সম্পর্কে স্বতঃই যা মনে উদিত হয়, তা হচ্ছে—'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!'

এই সংকলনের জন্য যে সকল কবি, সাহিত্যিক ও সংগীত-রচয়িতা সহযোগিতা করেছেন, প্রথমেই তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সময়াভাবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার অসুবিধায় অনুমতি গ্রহণ সম্ভব হয়নি। আশা করি কবির প্রতি এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের ক্ষেত্রে, তাঁরা আমার এই ত্রুটি মার্জনা করবেন। এই সংকলনের জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে যাঁরা নূতন কবিতা রচনা করে দিয়েছেন এবং যে সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিক একটি মাত্র কবিতাই রচনা করে কবির প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধানুভাব নিবেদন করেছেন, তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এই কবিতাগুলির একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই স্বীকৃত হবে।

এস্থলে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সংকলনের

তিনটি বিভাগের রচনাবলী যথাসম্ভব রচয়িতাদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী মুদ্রিত করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দোষত্রুটি লক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নয়; এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। স্থানাভাবে অনেক কবির কবিতা এই গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট করাও যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি খ্যাতিমান কয়েকজন কবির রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন কবিতা না থাকায় তাঁদের নাম সংশ্লিষ্ট করার গৌরব থেকেও আমি বঞ্চিত হয়েছি।

এই গ্রন্থে তিনখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। তিনটি বিভাগের বিভিন্ন ভাবকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই চিত্র-ত্রয়ের মূল্য আশা করি স্বীকৃত হবে।

এই সংকলন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীহুমায়ুন কবির এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' রচনা করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর পক্ষে বন্ধুবর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ-প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

॥ নাম-সূচী ॥

বন্দনা

সংগীত

বিলাপ

॥ চিত্র-সূচী ॥

কবি-প্রণাম

সপ্তপর্ণতরুতলে বন্দনারত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র চিরঞ্জীবেষু
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনম-দিবস আজি তোমার।
ধর উপহার বড় দাদার ॥
বিশ্বভারতী ভারতপ্রাণা
নানা দেশে ধরি মূরতি নানা,
প্রকাশিল লীলা অতি অপূর্ব।
কবি যবে দিলা গীত অনজলি
বলিলা জননী স্নেহরসে গলি
"কত আমি বিদেশে ঘুর্‌ব !
"এসেছিস্ তুই শুভ মুহূরতে
নিয়ে চল্ মোরে পুণ্য ভারতে,
শান্তি-সদন সেই আমার।"
নেপথ্যে ॥ বহুকালের প্রাচীন বৃদ্ধ ॥
সেই বালকটি সেদিনকার
পঞ্চষষ্টি হইল পার,
কাণ্ড একি চমৎকার !
পঠদ্দশায় নাবালক বৃদ্ধ ॥ চমৎকার না চমৎকার ॥

শুভকামী দ্বিজ ॥ নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি দীপ্তিমান্‌
বর্ষে বর্ষে এম্‌নি দিনে করিবে যবে ধেয়ান
তৎসবিতৃ দেবতার বরণীয় ভর্গ,
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীতে স্বর্গ ॥
সত্যজ্যোতি বিনা হায় আঁধার পৃথিবী।
আঁধারের আলো রবি হোক চিরজীবী ॥

বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় দর্শনে
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হ'ল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব-জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমৃতলাল বসু

কনককুসুম-বনে জীবন প্রকাশ।
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস ॥
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন।
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্মীয়-স্বজন ॥

সৌন্দর্য-আধার শিশু-সখা-সঙ্গী-সখী-মেলা।
সুন্দর সাজান ঘরে সুখে বাল্যখেলা॥
কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা।
লীলায়-খেলায় শুরু হ'ল চারু-শিক্ষা॥
ফুলে বাস বাসে শ্বাস খেলা মালিগিরি।
মানসে কবিতা-ফুল ফোটে ধীরি ধীরি॥
দেবেন্দ্র মন্দিরমাত্র এ মহানগরে।
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে॥
সুষমা-প্রতিমা সব হৃদি সুধাধার।
সৌন্দর্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার॥
বিনাইতে জানে কেশ বানাইতে বেশ।
সুচিত্র সাজিতে জানে সাজাতে সরেশ॥
সুকণ্ঠ দেছেন বিধি সুচারু শ্রবণ।
ভাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলাপন॥
কবিতা সবিতা শিশু আলো করে মন।
প্রেমের জাহ্নবী বহে জুড়াতে জীবন॥
বাণীর কমলবনে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।
মধুপান চিরদিন কুসুমে বিচরি॥
যেদিকে ফিরাও আঁখি সুষমার ছবি।
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেম-কবি॥

বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় দর্শনে

রাজকৃষ্ণ রায়

সরলতা, মধুরতা,
তরলতা, কোমলতা,
একসঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়ালে ওর গায় ?

বিস্মিত করিতে বিশ্ব
কে রচিল হেন দৃশ্য ?
এ মূর্তি প্রতিভাময়ী—ভরপূর প্রতিভায়।

কোমল কমল দিয়ে
এমন কোমল মেয়ে
কে গড়েছে প্রভাতের প্রভা মাখাইয়া তায়।

কারু শিরোমণি সেই,
তা'র গো তুলনা নেই,
ধন্য কারুকার্য তা'র শত ধন্য সে জনায়।

এত ভাব-ভরা ছবি
দেখেছে কি কোন কবি
আজিকার মত এই নিবিড় বনের গায় ?

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি'
একদৃষ্টে আঁখি মেলি'
চেয়ে আছি ওর পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্গবীণা নাহি রে, নিখিলে,—
সুধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা !
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে উছলিছে সুর,
আনন্দ-ঝরনা, ললিত মধুর ;
এ যেন রতির চরণ-নূপুর !
পরশে শিহরে ধরা !

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য-নন্দনে সুধা-প্রবাহিণী,
লীলায় উছলে চলে !
এ যেন গোলাপে শিশির পতন !
পূর্ণিমা-রাতির উছল কিরণ !
শেফালীর যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল দুলে !

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা !
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া আজি দীপ্তিময়ী !
সীতা-সতী-সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে !—কাঞ্চন-বরণী
কাঞ্চনের সমা !—সূর্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী !

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী,
রামচন্দ্র আসি চরণ-দু'খানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে !
পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা !—বহুদিন পর,
তোমার পরশে ! কাপি থরথর—
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

ভাগবতে যার অপূর্ব ভারতী,
ত্রিবক্রা কুব্জা পাইল যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব সদ্গতি,
গোবিন্দের আগমনে !—
ওহে জাদুকর, তেমতি তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি ;—
কুব্জা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর পরশনে !

পূর্বকালে যথা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে,
সৌধময়ী ট্রয়, উঠি আচম্বিতে,
রাজিল সহসা, কিরণ-রাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী !—
ওহে জাদুকর, তোমার সঙ্গীতে,
স্বর্গ-হর্ম্যময়ী, হাসিতে হাসিতে,
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে,
কিরণে কিরণময়ী ?

পূর্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোলে, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ-ভঙ্গে,

ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে,
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে জাতুকর, তোমার সঙ্গীতে,
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে !
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কলকল প্রবাহিণী !

এ জাহ্নবীতটে একি গো নেহারি ?
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,—
হেন হাস্যময়ী, রূপময়ী নারী,
নব হরিদ্বার কাশী !
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে,
ক্ষীর-সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,—
হাঁসিয়া ফেলিল হাসি !

বাণী-বরপুত্র ! সুধামকরন্দ,
বিভোর হইয়ে, বাণী বক্ষে পিয়ে,
মৃতসঞ্জীবনী, আনন্দের কন্দ,
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি !
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা—হয়ে আয়ুষ্মান,
থাক জননীর তুলাল সন্তান,
কিরণ-ছটায় বালার্ক-সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি !

রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়কুমার বড়াল

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা-সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরণ।
ঝরনা ঝিরিছে দূরে, বায়ু মৃদুশ্বাসে,
পাটল তটিনী—বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি!

স্বাগত

মানকুমারী বসু

স্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত!
চেয়ে আছে মাতৃভূমি,
কখন আসিবে তুমি
লইয়া ভরসা, বল, মধুর সঙ্গীত,

কবির আহ্বানে কবে
গাহিবে আনন্দ-রবে,
মৌন বন-বিহঙ্গেরা হ'য়ে পুলকিত!
মহাসিন্ধু হ'য়ে পার,
কবে আসি কোলে মা'র
জুড়াইবে তপ্ত হিয়া—অমৃত সিঞ্চিত?
চতুর্দশ বর্ষ শেষে,
রামচন্দ্র যথা এসে,
অভাগী কৌশল্যা মা'রে করিলা নন্দিত!

স্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত!
কি বলিব—ভয়দাত্রী,
এসেছিল কাল রাত্রি,
শব্দময়ী ধরা ছিল দারুণ স্তম্ভিত,
মানব খোলেনি আঁখি
ডাকেনি একটি পাখী,
ঝিঁঝি, ভেক সব ছিল হইয়া মূর্ছিত।
সহসা দেবের বর
দেখিনু অরুণ-কর,
অমনি সুমেরু-শিখে রবি সমুদিত।
অমনি আকাশ ধরা,
হইল আলোক-ভরা,
সঞ্জীবনী মন্ত্রে যেন বিশ্ব জাগরিত।
জাগিল উদ্যম আশা,
উদ্বোধিত ভাব ভাষা,
জড়তার অবসান জগৎ জীবিত।

ধরিত্রীর বক্ষ 'পরে, ঘূর্ণিত বাত্যায়
আকাশ মন্থিয়া ঘোর তমিস্রা-ব্যথায়'।

তুমি শুভদিনে জন্ম নিলে চিনে
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ-স্বরে
তোমার মঙ্গল আগমনী বঙ্গভূমে,
মহাকাল স্নেহ-ভরে পড়িল কি নুয়ে,
সপ্তরশ্মি তৃপ্তি পেল চুমিয়া ললাট,
হে কবীন্দ্র, হে রবীন্দ্র, আকাশ-সম্রাট !

তব জন্মকথা অপূর্ব বারতা
আমাদের জ্ঞান-অগোচর ;
জানি আজ বিশ্ব-চরাচর,
তব কীর্তি-কথা ঘোষে স্বদেশে বিদেশে,
তোমারে বরণ করি' নিল ভালবেসে,
চরণে ঢালিল অর্ঘ্য, দিল জয়-টীকা,
পারিজাত-কুসুমের অম্লান মালিকা !

শুধু বাংলার নহ তুমি আর,
সার্বভৌম কবি তুমি আজ,
বিশ্বগুরু করিছ বিরাজ
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের স্বর্ণ-হৃদয়-আসনে,
তব বাণী দীক্ষা-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র সনে
যুক্ত করে, ভক্তজনে মুক্তি-কামনায়
জপ করে, শান্তি-জলে সিক্ত করুণায়।

আমার স্মরণে,　　　　জীবনে মরণে,
　　গুরু তুমি, আদর্শে-মহান,
　　তব প্রীতি, তব বাক্য গান
নিঃসঙ্গের সঙ্গী মম, শূন্য নিরালায়
সাথী সে কৈশোর হ'তে, শান্তির কুলায় !

বৈজয়ন্তী তব,　　　　নিত্য অভিনব,
　　অসীমের বার্তা বহি' চলে,
　　সিন্ধুতটে ভূধরে অচলে,
আলোক-প্লাবন আনে দূরতম দেশে,
মেরু আর মরু-বক্ষ জাগে ভালবেসে,
মর্ত্যে তবু তুমি আজ হয়েছ অমর,
শান্তির দিশারী নেয়ে, দূত অগ্রচর ।

যে-কথা অন্তরে　　　　সুপ্ত চিরতরে,
　　জাগাইয়া, মোর মর্ম-বাণী,
　　মৌন ভাঙি, কহিলাম আনি'
চিরঞ্জীব, মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ-সম,
তুমি দীপ্ত, তুমি সত্য, তুমি নিরুপম !

রবীন্দ্রনাথ
প্রিয়নাথ সেন

তোমার সঙ্গীত-রবে স্পন্দিত বরষ—
ললিত রাগিণী কভু বীণার কাঁদন,
কভু বা মুরজ-মন্দ্র—গভীর বেদন
নর-হৃদয়ের ! যেথা বসন্ত-সরস

বাণী—বন অরণ্যের শ্যামল হরষ।
নিদাঘ-রুদ্রের সেথা রঙ্গীন নয়ন;
বরষা-উৎসবে পুনঃ সঘন শ্রাবণ—
ছন্দে ছন্দে বরষের বিচিত্র পরশ।

কালের অসীম নিশি আজি আলোকিত,
—চন্দ্র-সূর্যে নয়—তারা উঠে—অস্ত যায়—
প্রতিভার চিরোজ্জ্বল অমর প্রভায়
সমুজ্জ্বল চারি যুগ নয়নে উদিত!
কল্পনা-কাহিনী-কথা-কণিকা হীরার
চারি দিকে চারি রবি চতুষ্ক শোভার।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৃণালিণী সেন

বালিকা বয়সে মোর তুমি প্রাণে এয়েছিলে
অনন্তের আনন্দের বার্তা কাছে নিয়ে;
বাহিরের বিশ্বদ্বার তুমি খুলে দিয়েছিলে
ওগো শিল্পী অঙ্গুলির স্পর্শ তব দিয়ে।

তুমি পুনঃ দেখাইলে কত দুঃখ কত ব্যথা,
কন্টকের মত আছে বিদ্ধ করি ধরা;
কত ঘৃণা, কুটিলতা, নৃশংসতা, নির্মমতা,
করিয়া রেখেছে তারে সিক্ত রক্তাম্বরা।

প্রেম দিয়া, দয়া দিয়া রক্তধারা থামাইতে
কত তুমি শিখাইলে এত বর্ষ ধরি'—

যে দেবতা রয়েছেন মানুষের ভিতরেতে
জাগাতে চেয়েছ তারে প্রাণপণ করি'।

কতভাবে কতরূপে বলিয়াছ কথা তাঁর ;
জেনেছ তাঁহারে তুমি আপনার মাঝে ;
এখনো হয়নি শেষ কথা তব বলিবার ;
মানুষে দেবতা আজো ঘুমাইয়া আছে।

বর্ষ পরে বর্ষ গেছে, শ্রান্ত আজো নহ তুমি,
উচ্চ হ'তে আরো উচ্চে উঠিয়াছ খালি ;
আমার জীবন-সাঁঝে এসেছি আবার আমি
তোমারে অর্পিতে মম ভক্তি-অর্ঘ্য-ডালি।

এখনো তোমার কাছে কত শিখিবার আছে,
এখনো জীবনে সাধ কিছু করি কাজ ;
—তোমার মোহন স্পর্শে আবার নূতন সুরে
হবে কি পুরান যন্ত্র প্রাণপূর্ণ আজ ?

রবীন্দ্রনাথ

গিরিজাকুমার বসু

তোমাকে উদ্দেশ ক'রে, কি লিখিব আজি
সত্য, আমি জানি না তা, জ্বালি দীপশিখা
মৃত্যুঞ্জয় দীপ্তিময় জলদর্চি-শিখা
রবিরে কি দেখাইব ? উঠিতেছে বাজি'

কীর্তি যাঁর অহরহ দেশ-দেশান্তরে
ভক্তিনত মুগ্ধপ্রাণে বিশ্ব-মানবের
কোন্ স্তরে প্রেমধন্য এই হৃদয়ের
শ্রদ্ধা তাঁরে জানাইব লিপির অক্ষরে ?
শুধু আজ নিবেদিয়া প্রাণের প্রণাম
তোমার শতায়ু যাচি বিধাতার পাশে
বাঙালী তোমারে দেব ! যত ভালবাসে
তাহার তুলনা নাই, জানায়ে দিলাম।
একান্ত মোদের তুমি, শ্রেষ্ঠ গর্ব এই—
আমাদের বাণী মূর্ত, তব বাণীতেই।

বরণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তোমারে বরি হে কবি-সম্রাট
কবিসূয় মহাযজ্ঞে কবি !
বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র !
প্রতিভা-প্রতিমা অনুপ রবি !
কবি হোতা কবি উদ্গাতা হেথা
মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জধামে ;
যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী
আজি একত্র তোমার নামে।
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি ! তোমায় বরি হে আজি—
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।

অযুত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি তোমায় আরতি করি,
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি' ।
গান গেয়ে তুষি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে ;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে ।
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি
ব্যাপৃত নূতন বপন-কাজে,
কবি-নৃপমণি ! তব আগমনী
ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয়-মাঝে !

রবীন্দ্রনাথ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আকাশের রবি উজল কিরণে তার
শুধু ধরণীর এক পিঠ আলো করে,
ভূতলের কবি বন্দনা গাই যার
দুটি গোলার্ধের অন্ধকার যে হরে ।
করে যুগপৎ আলোকিত পুলকিত
স্নিগ্ধ শান্ত কান্ত সুনির্মল,
গৌরবময় দান সে অকুণ্ঠিত
করে যে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল ।
বেদনা-রক্ত-রাঙা এ ধরিত্রীর
বক্ষে তাঁহার করে কাল ছায়াপাত,

সহস্র করে মুছান নয়ন-নীর
আহ্বান করি' নবীন সুপ্রভাত।
উদয় অচলে সদা এ রবির ঠাঁই
বিধি অস্তের বিধান করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাব্যের জগৎ ছিল নাগালের বার—
দেবযক্ষরক্ষ নিয়ে তার কারবার!
রাম-নামে শিলা ভাসে সাগরের জলে—
প্রজানুরঞ্জন লাগি' সীতা বনে চলে!
অর্জুন-সারথি হ'ন নিজে নারায়ণ—
তাঁর কূট কৌশলেতে কৌরব-নিধন!
ফুল্লরা বেহুলা চাঁদ—যেদিকে তাকাই—
মানুষ মোদের মত দেখিতে না পাই!
কাব্য যত পড়ি, মনে ক্ষোভ জাগে তত—
এঁরা তো মানুষ ন'ন আমাদের মত!
দোষে-গুণে যে-মানুষ দেখি চারিদিকে
তাদের কথা তো কবি কাব্যে নাহি লিখে!
ক্ষুব্ধ মনে তুমি কর অমৃত সিঞ্চন—
আমাদেরি কথা কাব্যে তোমার লিখন!
পল্লীবালা, শহরের বধূ, জমিদার,
পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট—কথা বলি কার!
সর্বজীবে সমপ্রীতি শ্রদ্ধা অনুপম,
দরদ-মমতা-মায়া সৃষ্টিকর্তা-সম!

যে-কথা শুনালে কর্ণ-কুন্তী-গান্ধারীর—
সে-কথা এ-মানুষের মর্ত্য-পৃথিবীর !
অষ্টাদশ-পর্বে নয়, ঈষৎ ইঙ্গিতে
মানুষের মহাকাব্য রচি' ছন্দ-গীতে !
তুলির পরশে করি সবারে আপন—
প্রাণে প্রাণে মিলাইলে নর-নারায়ণ !

রবীন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কোন্ মন্ত্রে কবিবর পাষাণ গলায়ে
ভাষারে করেছ তুমি সুর-মন্দাকিনী,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার অমিয়া ছুটায়ে
মধুরিমা ভঙ্গিমায় দেছ সঞ্জীবনী।
কভু তার হেরি নৃত্য ললিত মধুর,
আবেশ-বিহ্বল কভু শুনি গীতধ্বনি,
সেই গীতে বাজে কত মরমের সুর,
কত অকথিত বাণী গোপন কাহিনী
নিকুঞ্জ মর্মরি' উঠে কূলে কূলে তার।
ফুলে ফুলে শোনা যায় ভ্রমরগুঞ্জন,
উরসেতে চিকিমিকি চাঁদিমার হার,
কত না জড়িত তাহে বিস্মৃত স্বপন,
বাণী-ভাণ্ডারের মধু সব নিঙাড়িয়া
ফেনিল হিল্লোলে কবি দিয়েছে ঢালিয়া।

অপূর্ব মুকুরে

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

তোমার কবিতা নহে কবিতা কেবল—
সৃজিয়াছ মায়াঙ্কনে অপূর্ব মুকুর···
সুখী দেখে আপনার হাসি-শতদল,
আপন বক্ষের শ্বাস বেদনা-বিধুর।
যার চাহি ভগবান—চির-রূপ তাঁর
হেরে সে স্বরূপে—তাঁর হর্ষিত আনন,
অবিশ্বাসী দেখে তার কোথা অনাচার,
সন্দেহীর কোথা দুঃখ অজ্ঞাত পতন।
পথভ্রষ্ট চলিয়াছে কোন্ মৃত্যু-পথে,
অন্তরাত্মা গুমরিছে কোন্ হতাশায়,
নিখিল হৃদয়হীন কোন্ মিথ্যা ব্রতে—
পরিণাম নাহি জানি' ছুটেছে কোথায়—
আপনারে ছাড়ি' বিশ্ব গেছে কত দূরে—
দেখায়েছ, ঋষি, তাহা তোমার মুকুরে।

বরণ

কালিদাস রায়

আমাদের এই খেলার ঘরে গুরু তোমায় বরণ করি,
বনশেফালির অঞ্জলি আজ রাখি তোমার চরণ 'পরি।
পূজোপচার পাইনি খুঁজি,
গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজি,
নিঃস্ব মোরা, ডুবল তোমার পূজার উপচারের-তরী।

প্রজাপতি, তোমার করেই মোদের মানস-জীবন গড়া,
তোমার সৃজন-মূর্ছনাতে মোদের পরাণ শ্রবণ ভরা।
তোমার স্নেহ-বাপীর বুকে
মীনের মত বেড়াই সুখে,
তোমার চরণ-কমলদলে মুখর মোদের মন-ভোমরা।

অস্বাদিত রসের বিলাস বিলালে এই জীবন ভরি',
নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে নিসর্গেরে শোভন করি';
কলির প্রাণে নবীন গন্ধ,
অলির গানে নূতন ছন্দ,
তোমার সভায় এলো সবাই নয়নমোহন ভূষণ পরি'।

অনাদৃত হীন হেয় যা' নয়নে তা'ও লাগলো ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝরনা হ'য়ে ঢাললো আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে
তোমার তুলির টানটি জাগে।
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।

কল্পলতা লক্ষ পাকে জড়ালো ঐ বক্ষটিরে
কল্পগরুড় স্বপন দেখে তোমার গহন ধ্যানের নীড়ে।
ছুটে ত্রিলোক সীমার শেষে,
দৃষ্টিশায়ক অসীম দেশে।
অনন্তদেব ছায়া যোগায় হাজার ফণায় তোমায় ঘিরে।

সুপ্ত অভিশপ্ত দেশের ঘুমে তুমিই আশার স্বপন,
তোমার বাণীর অন্তরালে সুপ্ত মোচন-মন্ত্র গোপন।
চিত্ত-কারার বাঁধনগুলি
আগেই তুমি ফেল্‌লে খুলি।
জীবন-মরুর বালুর তলে জয়ের বীচন করছ রোপণ।

আজ নিখিলে ওতপ্রোত তোমার মুখের মন্দ্রবাণী,
করছে সাগর-তরঙ্গেরা দিগ্‌বিদিকে কানাকানি ;
বার্তা চলে সূর্য-সোমে
তূর্য বাজে ব্যোমে ব্যোমে
পুলক জাগে রোমে রোমে, অবাক্ ধরা যুক্তপাণি।

হিমাদ্রির ঐ শুভ্র শিরে উড়ছে তোমার জৈত্রী কেতু
রচলে তুমি পারাবারের এ-পার ও-পার মৈত্রী-সেতু।
দীক্ষা দিয়া প্রেমের বেদে
মিলাইলে সকল ভেদে।
গড়লে তুমি মিলন-ত্রিদিব এই ভারতের মোক্ষ-হেতু।

আলোক-বীণা বাজাও কবি নীল আকাশের পদ্মাসনে,
সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়ুক পশ্চিমের ঐ দিগঙ্গনে।
দগ্ধ করুক ঐহিকতার
ধূম্র-ধূসর বিশাল প্রসার
ভস্ম হ'তে জাগাও পুনঃ শাশ্বত সেই সত্য ধনে।

মিলন-গুরু ! এই ভারতের মহামানব-সাগরতীরে,
উচ্চার' হে উচ্চরবে বিশ্ববেদের মন্ত্রটিরে।
ধর্ম-জাতি-নির্বিশেষে
মিলবে তথায় সবাই এসে
বিশ্বভারতীর দেউলে জুটবে নিখিল নম্র-শিরে।

পুব-গগনে আবার রবি নবীন হ'য়ে উদয় হ'লে
মানস-সরের কমলগুলি তোমার পানে হৃদয় খোলে।
গন্ধবহ ঢুলায় চামর
কাব্যকানন কূজন-মুখর,
আবার মোদের কুলায়গুলি আনন্দ-হিল্লোলে দোলে।

কল্পলোকের হে সবিতা, মোদের মাঝে, তোমায় বরি,
ধন্য জীবন তোমার কিরণ আশিসধারা মাথায় ধরি'।
কর প্রাণের আঁধার মোচন,
বিকচ কর জ্ঞান-বিলোচন,
প্রণাম করি, সহস্রকর, সহস্রবার প্রণাম করি।

পঁচিশে বৈশাখ

নরেন্দ্র দেব

দূর আজ এসেছে নিকটে।
তবু চিত্রপটে
বিশ্ব আজও তেমনি বিশাল।
সেই মহাকাল
ছুটে চলে নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
ভাঙা ও গড়ার ইতিহাস
চরণ আঘাতে তার
বিচ্ছুরিয়া ওঠে বার বার।

যুগান্তের পটভূমিকায়,
ডোবে চাঁদ, সূর্য অস্ত যায়;
কীর্তি কত লুপ্ত হয় কীর্তিনাশা-জলে:
বিস্মৃতির বিধ্বস্ত অতলে
নামাবলী হতেছে বিলয়;
মৃত্যু জয়ী নয়—কিছু নয়।

জনমন আলোকে উথলি',
যশের যে দীপ উঠে জ্বলি

শিখা তার ক্ষণেক ঝলকে।
ঘূর্ণ্যমান কালের ফলকে
যে লিখা রাখিয়া যায়
জানি জানি একদা তা নিঃশেষে মিলায়!

তবু চাই আগ্রহে উৎসুকে—
এ প্রাচীন পৃথিবীর বুকে,
এসেছিল যে সুন্দর পরম অতিথি ;
তার জন্ম-তিথি—
চির অবিস্মৃত হয়ে থাক্,
'পঁচিশে বৈশাখ'।

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে আকাশ নীলোজ্জ্বল, হে গভীর মত্ত পারাবার,
হে ধরণী সুশোভনা, হে দক্ষিণা বায়ু মন্দভার,
হে শারদ মেঘমালা, হে একাদশীর স্নিগ্ধ চাঁদ,
দুলাল কবিরে তব স্নেহ দাও, করো আশীর্বাদ।

কেতকী, করবী, যূথী, বকুল, চম্পক, শেফালিকা,
হে আকন্দ অনাদৃত, হে অশোক, পলাশ, মল্লিকা,
হে তৃণ-কুসুম-গুচ্ছ, শুভ্র কাশ পবন-চঞ্চল,
হে নবীন-ধান্য-শীর্ষ, বরো তব প্রেমিকে উজ্জ্বল।

হে শৈবাল-দল-বক্ষ বঙ্গের অগণ্য নদ-নদী,
হে পদ্মা প্রলয়ঙ্করী—সৃজনে উদ্বেল নিরবধি,

হে বঙ্গ-প্রান্তর শ্যাম উন্মুক্ত দিগন্ত প্রসারিয়া,
করো করো স্নেহাশীষ তরঙ্গ-তৃণের বাহু দিয়া।

হে বর্ষণ ঝুরুঝুরু, হে সন্ধ্যার সোনার গরিমা,
হে নিস্তব্ধ-রাত্রি-গর্ভ হ'তে জাগা প্রচণ্ড মহিমা,
হে কাল-বৈশাখী নৃত্য, লঘু মেঘ আলো-ছায়া-করা,
দাও দাও মিত্রে তব স্নেহ দাও সুধা-প্রীতি-ভরা।

হে অতুলা বঙ্গবাণী, চণ্ডীদাস-বঙ্কিম-জননী,
গুপ্ত-মধু-ভূষাময়ী, রবি-পূতা, রবির বরণী,
দেশ-দেশ-নন্দিতা গো স্ফূর্তা শ্যামা অপরূপ-জ্যোতি,
তোমারে দিল যে প্রাণ আজি তারে দাও প্রাণগতি।

বৈদিক তাপসতুল্য, দৃষ্টি যার বিশ্বের অপার
রহস্যে করিয়া ভেদ, মানবের হৃদয়-আগার
তন্ন তন্ন করি' আনে গুপ্ততম সূক্ষ্ম যত ব্যথা,
সে-দৃষ্টি অক্ষয় হোক্ প্রকাশিতে বিচিত্র বারতা।

প্রীতি-অনুরাগ-বদ্ধ শুধু এ ভারতভূমি নয়,
স্বপনে উদিল যার অখণ্ড-মানব-পরিণয়,
কালে কালে গত অনাগত যুগে মানব-মিলন
সাধিতে সাধনা যার, বিশ্ব তারে করে যে বরণ।

অজ্ঞাতে জানাল যেবা, অনাগতে করিল আগত,
অননুভূতেরে যেই অনুভবি' করে চিত্তগত,
সুদূরে নিকট সাথে যেই জন ঘটাইল বিয়া,
চেনাল অপরিচিতে,—সে যে আছে ভরি' সর্ব-হিয়া।

কবি-প্রণাম

কল্যাণ-বার্তায় ঋষি, প্রেমগানে উন্মত্ত প্রেমিক,
স্বদেশাত্মা-দীক্ষা-যজ্ঞে ক্লান্তিহীন সাধক ঋত্বিক্,
রঙ্গালাপে রসমূর্তি, অন্যায় দলনে রুদ্ররূপ,
ভারতীর রত্নাসনে আজি সে যে দণ্ডধর ভূপ।

সুখহাসিটিরে যেই করি' দেছে অধিক উজ্জ্বল,
স্নেহসুধা মাখাইয়ে প্রিয়তর করে গৃহতল,
আরো মধু করে দান প্রেয়সীর নয়নে অধরে,
জননীর স্নেহে দেছে বাড়াইয়ে শিশু-মুখ 'পরে।

কত শত সুর যেবা রেখে দেছে করিয়া মধুর,
কত না দুখের কাঁটা প্রীতি দিয়ে করি' দেছে দূর,
সাগরে গগনে বনে ধরণীতে দেছে নব শোভা,
আষাঢ়ে বসন্তে যেবা করিয়াছে আরো মনোলোভা ;

ভারতী যাহার গানে মুগ্ধা হ'য়ে রাখে নিজ বীণা,
সমৃদ্ধা গৌরব-পূর্ণা কণ্ঠে যার বঙ্গভাষা দীনা,
আকাশ নিস্তব্ধ যার শুনি' নব সুরের মূর্ছনা,
যাহার মানস-রথে সুষ্ঠু মান লভিল কল্পনা ;

গাহি তারি জয়গান, তারি জয় গাহে বঙ্গভূমি,
আলাপে আনন্দে দুখে সে যে আছে সর্বচিত্ত চুমি'।
লহ শ্রদ্ধা, লহ ভক্তি, লহ প্রীতি, লহ নমস্কার,
হে কবি, তোমারি জয়ে সুখ-হর্ষে হৃদয় দুর্বার।

পঁচিশে বৈশাখ

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আজিকে শোভন মূর্তি তোমার ভুবন জুড়ে পূজছে সবে !
বলছে সকল দেশের গুণী, 'কবির সেরা তুমিই ভবে'।
লড়াই করে মানুষ মেরে বড়াই করে সদাই যারা,
তারাই তোমার পায়ের 'পরে লুটতে আজি পাগল-পারা !
বঙ্গ-সরস্বতীর গলে বিজয়-মাল্য পরাও তুমি !
তোমার কাব্য-সুধার লোভে তীর্থ হ'ল বঙ্গভূমি !

সপ্তসাগর ডিঙিয়ে এল অর্ঘ্য তোমার বাংলা দেশে !
হিংসুকেরা অবাক্ হ'ল, রসজ্ঞেরা উঠল হেসে !
কদর যারা করতো না, হায়, মাতলো শেষে বন্দনায় ;
নিন্দা ভুলে নন্দিতে ফের একগাড়ি-লোক বোলপুরে ধায়।
সে-সব কথা ভুলব না তো, ভুলব না তো যাবৎ বাঁচি ;
কোকিল হেথায় পায় না আদর, আদায় করে মশক মাছি !

'প্রাচ্য প্রাচ্য, প্রতীচ প্রতীচ, প্রাচ্য-প্রতীচ মিলবে না রে !'
কিপ্‌লিঙের এই গর্ব-বাণী খর্ব কে আর করতে পারে ?
জগৎপূজ্য হে কবিবর, তা-ও দেখালে কথায় কাজে !
কিপ্‌লিঙও তা দেখতে পেলো, দেখছে আজো গভীর লাজে !
ইয়াদ রেখো, সাগরপারের হামবড়া সব নকল কবি !
তোমরা আপন দেশের চেনা, জগৎ চেনে বঙ্গ-রবি !

এমন কিছু হয়নি সৃজন, পায়নি ভাষা তোমার কাছে
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে তোমার পূর্ণ দৃষ্টি আছে !
চর্ম-চক্ষু যায় না যেথা, কল্পচোখে দেখলে তা-ও !
সাধ মেটেনি, শুনবো আরো, একশ বছর এমনি গাহো !

কবি-প্রণাম

তোমার স্নেহে ধন্য আজি, ধন্য তোমার অনুগ্রহ !
সত্যদর্শী হে ঋষি, আজ দীন সেবকের প্রণাম লহ !

স্মরণে

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

একদা এ বিশ্বমাঝে চলেছিল যবে হানাহানি,
জেগেছিল হিংসা দ্বেষ, কেহ কারে ভালোবাসে নাই,
সে দৃশ্য তোমায় কবি ব্যথিত করেছে ব্যথা দানি
আকুল করেছে তোমা, বেদনাবিধুর হিয়া তাই !

সুন্দর ধরার বক্ষে কেন জাগে ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ,
মানুষে মানুষে কেন প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে নাকো,
কেন এরা গড়ে নেয় শুধু আপনার পরিবেশ,
বন্ধুকে ফিরায়ে দেয়, বলে নাকো তারে—'তুমি থাকো'।
হিংসাবিষ-জর্জরিত এ ধরার করুণ ক্রন্দন
পশেছিল কানে তব—তাই তুমি চেয়েছিলে ঋষি,
মুছে নিতে এই গ্লানি, খুলে দিতে চেয়েছ বন্ধন,
অহিংসার মহামন্ত্র ছড়াইয়া দিতে দিশি দিশি।

মহাভারতের আজ হয়েছে যে নব-উদ্বোধন,
মহাকবি, এ তোমার অন্তরের একান্ত কামনা,
পরস্পরে ভালোবেসে সার্থকতা লভে জনগণ,
হে মহর্ষি, ভারতের আজ হ'ল সফল সাধনা।
আজি তব শতবর্ষ জন্মদিন স্মরি'
আমরা এনেছি অর্ঘ্য, তোমারে তা নিবেদন করি।

পঁচিশে বৈশাখ

অমল হোম

পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো, ঘুরে আর বার
রবি-প্রদক্ষিণ-পথে ; রবির বন্দনা-গান
উঠে বাজি' স্থলে জলে নভোতলে, মন্দ্র তার
ছায় দশদিশি ; ভরি' দেয় সেই রম্য তান
নিখিলের মর্ম্মমাঝে, যেথা বাজে অনাহত
বীণা, তন্ত্রী অভিনব, নবভাষা, নবপ্রাণ ;
উদয়ের পথে, লয়ে আশা ভালোবাসা কত,
আশীর্বাণী দিলো আনি মধুচ্ছন্দ-গান।
শান্তশ্রী নামিয়া এলো ক্লান্ত ধরণীতে,
বুলাইল মন্ত্র তার বিষবাষ্প মাঝে,—
দূরে গেল বিভীষিকা, নাহি জল আঁখিপাতে,
মৃত্যু নাই, শোক নাই ; এসো সাজি শুভ্র সাজে ;
মাল্য দিই বেদীমূলে ; পুষ্প দিই অর্ঘ্যথালে ;
ধূপ জ্বালি, দীপ জ্বালি নব রবি জন্মভালে ॥

ছায়া রবি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আকাশ বিস্ময়ে চায়
সপ্তবর্ণে পৃথ্বী ভায়
রবিরশ্মি কাঞ্চনজঙ্ঘায়,—
সাগরে তটিনী-জলে
উপলেও ঝলমলে
প্রবালের পলায় পলায়।

কবি-প্রণাম

রবি নাই ?   রবি আছে
(—রবিরে আ-বরিয়াছে—)
রবিরশ্মি হরিয়াছে
রবিময়ী 'ছায়া' রবি-প্রিয়া—
উদয়নে আবির্ভাবে
অস্তায়নে তিরোভাবে
উদয়াস্তে একবর্ণ নিয়া।
রবীন্দ্রে মহেন্দ্রপুরে
অভিষেক মন্ত্রে সুরে
করে আজি প্রত্যভিনন্দন,
যে রবি স্বর্গেরে আনি
পৃথিবীরে সম্প্রদানি
দিল বাঁধি রাখীর বন্ধন।

রবীন্দ্র-বন্দনা

হেমেন্দ্রলাল রায়

ভৈরব জলদ গর্জে, দিক ভাঙি বর্ষা নেমে আসে,
জ্বলে বজ্র-রেখা
হরিৎ ধান্যের শীর্ষে, নব আম্র-মুকুলের বাসে
দীপ্তি দেয় দেখা।
ফুকারিয়া দিকে দিকে তৃষার্তের তপ্ত-বিভীষিকা
প্রলয়-পিনাক,
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা নেমে আসে রুদ্র-রৌদ্র-শিখা
ধূসর বৈশাখ।

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি সাগরের শব্দবন্ধ টুটি'
জাগে তব নাম,
সহস্র বিদেশী-বক্ষে বন্দনার পুষ্প উঠে ফুটি—
করিছে প্রণাম।
কে তারে পাঠায়ে দিল কোন ক্ষণে কবে চুপে চুপে
কেহ নাহি জানে,—
তারা শুধু বরি' নিল প্রতিভার একচ্ছত্র ভূপে
বিস্ময়ে—সম্মানে।

অমর তোমার বীণা, বিশ্বেরে নিয়েছে জিনে, কবি,
জয়—তব জয়—
সাধনা জাগিয়া থাকে জন্ম জন্ম জয়মাল্য লভি' ;
নাহি তার ক্ষয়।
নিখিল কাব্যের পরে মূর্ত দীপ্ত সাধনা তোমার
রবে চিরদিন,
এ নহে স্তুতির ভাষা, ক্ষুদ্র আত্মপ্রবঞ্চনা ভার,
অসত্য মলিন।

বিদেশে উঠেছে রব—জয় হোক—জয় হোক তব—
ফুটে তব স্তব,
স্বদেশের নর-নারী একসঙ্গে গাহে অভিনব
জয় জয় রব।
তারি সাথে ভক্ত আমি—জয় হোক গাহি উচ্চৈঃস্বরে,
হে বিশ্বের কবি,
জয় হোক—জয় হোক—গাহি গর্বে—গাহি স্পর্ধা-ভরে,
জয় হোক রবি !

রবীন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

রূপ-সায়রে ডুব দিয়ে কী তুলে অরূপ রতন
শোভার সার গাঁথিলে হার নিখিল চিত্ত-হরণ !
বিশ্ব-বাণীর গলায় দিলে মহানন্দে ভাগ্যবান
গানের সুরে জয় করিলে মহানন্দে বিশ্বপ্রাণ !
এই বাঙালী আসল ধনে কোনোদিন নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরিয়া গেল তব দানে বিশ্বময় ;
জগৎবাসী বন্দনা গায় বিশ্ব-কবি বাঙালীর,
ভিড় জমেছে বাঙলা দেশে জ্ঞান-ভিক্ষু কাঙালীর।
তাই-না আজ বাঙলা হ'ল মহাতীর্থ সাধনার !
ঈর্ষীর হায়, ব্যর্থতা সার হীনকর কামনার !
হে ঋষি, তব অমোঘ মন্ত্র দিয়াছে যে প্রাণ-শক্তি
দানিবে তাহা মরণ-জয়ী সুকল্যাণ আশু-মুক্তি।
বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ, বাঙালীরে দেছ ভাষা,
জগতে দেছ আঁধারে আলো, নিরাশায় দেছ আশা।

জাতি-বিস্মর

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন ধ'রে—
কত যুগ তা কে জানে,
রবি সে পাঠায়ে রশ্মির দল
এই ধরণীর পানে—
যা ছিল রুক্ষ, সুকঠোর অঙ্গার,
অঙ্গে অঙ্গে তার

ভরে দিল রূপ-রস-গন্ধের
অপরূপ সম্ভার।
কে জানে কী জাদু,
ছিল সে-রশ্মি পরে—
কোথা ছিল কী যে সুপ্ত চেতনা—
জেগে ওঠে থরে থরে।
সে-চেতনা জেগে ওঠে
রোমাঞ্চ হ'য়ে তৃণের গুচ্ছে,
লতা-তরুশাখে
কুসুমিত হ'য়ে ফোটে।
সুপ্তি-ভঙ্গে আরও এল—
এল প্রাণ,
দিকে দিকে তার স্পন্দন জাগে—
শত বিচিত্র,
ঝকে ঝকে ওঠে
সে-রবির জয়গান।
বহুদিন ধ'রে—
কত যুগ তা কে জানে,
রবি সে পাঠাল রশ্মি তাহার
এই ধরণীর পানে।

কিন্তু, কত-না দূর !
(তাই) দেখে নাই রবি এ-রূপ-সুষমা
শোনে নাই এর সুর।
তাই বুঝি একদিন,
না জানি কি কুতূহলে,

নেমে এল রবি এই ধরণীতে
আপনারে গিয়ে ভুলে।
আর সে নয় তো অনন্ত নভে
দুর্নিরীক্ষ্য রবি,
যার হ'তে দিঠি
জ্বালা ল'য়ে আসে ফিরে,
বিশ্বের যত স্নিগ্ধ শান্তি
এ-রবিরে আছে ঘিরে।
উৎপল-আঁখি দুটি
বিস্ময়ে আছে ফুটি,
যা-ই দেখে, আহা, অপরূপ তার সবই,
রবির ধরণী রবিরে করেছে কবি।
যাহা শোনে তাহা অবাক হইয়া শোনে,
কে যে তার চারিদিকে
মায়া-তন্তুতে কী সুরের জাল বুনে
ফেলে তারে কোন্ ফাঁদে,
কইতে সে চায় কণ্ঠে না পায় সুর,
হার মেনে তাই
পরাণ তাহার কাঁদে।

সারা ধরণীতে
শতপাকে ঘুরে ঘুরে
দেখে নিল কবি, শুনে নিল তার সুর,
তারপর একদিন
ধরণীরে করি দীন,
শ্রাবণধারায় গলায়ে তাহার আঁখি,

চ'লে গেল রবি
স্মৃতিটুকু তার রাখি'।
তার মতো আর কেহ দেখে নাই
এ ধরণীরে এত ক'রে
বক্ষের মাঝে ধ'রে।
শোনে নাই এর হৃদ্-মর্মের ধ্বনি,
তার মতো ক'রে সে কথা বাখানি
বলে নাই কোন গুণী।
তার মতো ক'রে
জানে নাই কেহ তারে
তিল অনুতিল ধ'রে।

শুধু জানিল না
সেই জাতি-বিস্মর,
অঙ্গার আজি তিল-উত্তমা
লভি শুধু তারই বর।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি
যোগীন্দ্রনাথ রায়

সুপ্ত বঙ্গে কে তুমি বন্ধু গাহিলে অমর গান
নিত্য-নূতন মায়া বিরচিলে বিস্তারি কলতান।
ছন্দে তোমার নাচিয়া উঠিল সিন্ধুর বীচিমালা,
স্পর্শে তোমার চেতনা লভিল সুপ্ত অমরা-বালা।
সাগরে সলিলে বনে কান্তারে গ্রহ তারা উপগ্রহে—
নন্দিত করি' নিখিল-চিত্ত করুণার ধারা বহে!

যেথায় আরতি করিছে সূর্য, মরুৎ দৌত্য করে,
চন্দ্রের হিয়া অমিয় ছানিয়া বিগলিত নির্ঝরে।
আদি-যুগ হ'তে যেথায় বাজিছে কবির মোহন-তন্ত্রী,
তোমার কাহিনী পশিছে সেথায় দৈন্য-দহন-হন্ত্রী।
অমরার সাথে বসুধার ধারা মিলাইল তব ছন্দে—
সাত-সমুদ্র তাইতো আজিকে তোমার চরণ বন্দে।
তাই দেখি আজ, মুকুটের সাথে মহামানবের মেলা—
রাজার মহিমা তুচ্ছ মানিছে কমলার দেওয়া চেলা।
আমাদের এই ধরা-মা'র বুকে, নবজীবনের পালা ;
বাণীর দুয়ার হ'ল যে রে আজ লক্ষ্মী-দুলান-শালা !
চিত্তের ক্ষুধা সুধায় ভরিল, বিত্ত পাইল নিঃস্বে,
রবির রশ্মি লুটায়ে পড়িল আঁধার-জড়ান বিশ্বে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গোলাম মোস্তফা

সালাম সালাম তোমায় আজি, হে কবি-সম্রাট,
মুকুটবিহীন বাদশা মোদের—অক্ষয় রাজপাট।
বখ্‌ত্‌ মোদের নেক্‌
তোমার অভিষেক—
সভায় আজি করছি তোমার এই 'কসিদা' পাঠ।

নামটি তোমার 'রবি'—তুমি রবির মতই ঠিক,
তোমার আলোয় উঠ্‌ল হেসে ধরার চতুর্দিক,
পূর্ব ও পশ্চিম
নির্বাক নিঃসীম
চেয়ে আছে তোমার পানে নয়ন-অনিমিখ্‌।

রবি-কবি গগন-পারে লেখেন কবিতা—
আলোক-রেখায় আঁকেন ছবি শিল্পী-সবিতা ;
গভীর আনন্দে
বিচিত্র ছন্দে
সুর বাজে তার 'আকাশ-বীণায়'—জানি সবি তা' ।

কবি-রবিও তেমনি মোদের ধরার ধূলির 'পর
ছন্দে-গানে 'লেখন' লেখেন বিচিত্র সুন্দর ।
গর্বিত আকাশ,
কিসের দেখাও ত্রাস ?
মোদের রবি তোমার রবির চাইতে কি কম্‌তর্‌ ?

রবির মতই কিরণ তাহার দীপ্ত দহনে
পশেছে আজ মনের বনের গভীর গহনে ।
ব্যক্ত চারিধার
মুক্ত সবার দ্বার,
ধরণী আজ ধন্য তাহার পরশ বহনে ।

প্রণাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গের মানসরাজ্যে তুঙ্গশীর্ষ ব্যাপ্ত দিগন্তর
হে কবি নগাধিরাজ, দেবতাত্মা নমো নমো নমঃ
মাটির প্রাণের অর্ঘ্য পদতলে প্রগাঢ় সুন্দর
শ্যামায়িত বনরাজি ; মেঘ-স্বপ্ন উত্তরীয় সম
শোভিত বিশাল বক্ষে ইন্দ্রধনু বর্ণসুষমায় ;
অম্বরচুম্বিত ভাল, উদাসীন অনন্ত সন্ধানী,

হিমানীচন্দনলিপ্ত, শোন নিত্য প্রভাত সন্ধ্যায়'
আকাশগঙ্গার পারে সূর্য চন্দ্র তারকার বাণী ;
কাব্যে গানে মধুস্যন্দ সে বাণীর সুধারসধারা
জীবনের অন্ধ ভূমিগর্ভে যেন সূর্যের আহ্বান
আমাদের শুনায়েছ ; অনাগত অঙ্কুরের সাড়া
মূর্ছিত বীজের বক্ষে—প্রাণের বিস্মিত অভিযান
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চিৎ-রসসিন্ধুতীর্থে স্নান করি'
অভয় আনন্দ ল'য়ে কালের দিগন্ত আছ ভরি ।

হে রবি, বিশ্বের আদি কবি

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সেদিন চম্পক-বনে মর্মরিত সুরভি নিঃশ্বাস
রবির পরশ লভি' অনুদ্ভিন্ন দলে স্বর্ণ-শোভা,
থরে থরে বিস্তারিয়া ফুল-জন্মে আনিল আশ্বাস
বৃন্তে বৃন্তে পরিপূর্ণ সম্বৃত সৌন্দর্য মনোলোভা ।

বসন্ত বিদায় নিল,—মঞ্জরিত চূত বল্লরীর
মৃদু গন্ধে আমোদিত বৈশাখের উদাসী বাতাস,
ক্ষণে ক্ষণে জাগে আশা ম্রিয়মাণ মনে বল্লভীর
ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হয় মিলনের অপূর্ব আভাস ।

বৈশাখের খর-রৌদ্রে রুদ্রবীণা ওঠে ঝংকারিয়া,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঝরে অঙ্গুলির ক্ষিপ্র সঞ্চরণে,
শতাব্দীর সূর্য বুঝি পূর্ণ তেজে এল বাহিরিয়া
যুগের এ সন্ধিক্ষণে দেখা হ'ল জীবনে মরণে ।

হে সূর্য অমিত বীর্য, হে রবি, বিশ্বের আদি কবি,
উর্ধ্বমুখী ধরণীর অর্ঘ্য লও প্রসন্ন আননে,
তব মন্ত্রে প্রকাশিত ভূমার এ অনিন্দিত ছবি,
তোমার সঙ্গীতে মুগ্ধ বাণী তাঁর শ্বেত পদ্মাসনে।

পঁচিশে বৈশাখ

স্থফী মোতাহার হোসেন

কালের নেপথ্য হতে পঁচিশে বৈশাখ বারে বারে
ডাক দেয় ধরণীরে তব পুণ্য স্মৃতি-উদ্‌যাপনে।
তারি উদ্‌বোধন-গীতি দিকে দিকে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
ধীর আয়োজন যেন পত্রে পুষ্পে পূর্ণ করে তারে।
নিগূঢ়ের মন্ত্রখানি বৈশাখীর বীণার ঝংকারে
মেঘ-মন্দ্র রবে কভু, কভু খর রবির কিরণে
আপনি বাজিতে থাকে, ধ্বনি তার ঘনায় যে মনে
কুসুম-বাণীটি কার ফুটে বনে ফুল-উপহারে।
বঙ্গের অঙ্গন ঘিরি মাসে বর্ষে ফোটে যেই ফুল
বর্ষা বসন্তের ছন্দে যে-কবিতা নিত্য-উচ্ছ্বসিত
বেদনা আনন্দঘন, রসগূঢ়, আসে ঘনাইয়া
অরূপের রূপ-স্বপ্ন, অমৃতের বাণী সাথে নিয়া ;
সেথা তব নিত্য স্মৃতি, হে কবীন্দ্র, সেথায় ছন্দিত
তোমার অমরকাব্য, পুণ্যশ্লোক গম্ভীর, বিপুল।

কবি-প্রণাম

তীর্থ-পথিক

নজরুল ইসলাম

আমি জানি তুমি অজর অমর, তুমি অনন্ত প্রাণ ;
মহাকালও নাহি জানে, কবি, তব আয়ুর সে পরিমাণ।
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি অক্ষয় বট,
বিশ্ব জড়ায়ে রয়েছে তোমার শত কীর্তির জট ;
তোমার শাখায় বেঁধেছে কুলায় নভোচারী কত পাখি,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় জুড়াই ক্লান্ত আঁখি।
বিজ্ঞান বলে, বলুক, রবির কমিয়া আসিছে আয়ু,
রবি রবে, রবে যতদিন এই ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু।
মহাশূন্যের বক্ষ জুড়িয়া বিরাজে যে ভাস্কর
তার আছে ক্ষয়, এও প্রত্যয় করিবে কোন্ সে নর ?
চন্দ্রও আছে, আছে অসংখ্য তারকা রাতের তরে,
তবু দিবসের রবি বিনা মহাশূন্য সে নাহি ভরে।
তুমি রবি, তুমি বহু ঊর্ধ্বের—তোমার সে কাছাকাছি
যাবে কোন্ জন ?   তোমার কিরণ-প্রসাদ পাইয়া বাঁচি।
তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,
তব গুণ-গানে ভাষা সুর যেন সব হ'য়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী
প্রার্থনা মোর যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্যে-গীতে ॥

রবীন্দ্রনাথ

সুবোধ রায়

পূর্ণ জীবনের মুক্ত বাতায়নে বসি'
দেখিছ বিশ্বের পথে কেবা আসে যায়,
কেবা হাসে, কেবা কাঁদে, কেবা গান গায়,
কেবা অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চে পশি'।
সে কাহিনী ছন্দে তব লভিল যে ভাষা,
নীরব নিথর বিশ্ব সঙ্গীত-মুখর,
নবরূপে দেখা দিল সত্য ও সুন্দর,
জাগাল তমিস্রলোকে আলোকের আশা।

ছন্দ তব গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
নীহারিকাপুঞ্জে তোলে জীবন-স্পন্দন
ধরায় ফুটায় শোভা স্বরগ-নন্দন
সিঞ্চিছে মানব-চিত্ত পীযূষধারায়।
বাণীর পূজারী তুমি বাঙ্গলার কবি
বিশ্ব-কাব্য-গগনের জ্যোতির্ময় রবি

অর্ঘ্য

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি যা দিয়েছ, কবি, অনির্বচনীয়!
তৃষাতুর কণ্ঠে দিলো স্বর্গের পানীয়
তব কাব্যমন্দাকিনী! দিয়েছ নয়নে
নূতন উষার স্বপ্ন। সঞ্চারিলে মনে
মহান আদর্শে নব বলিষ্ঠ বিশ্বাস।

মর্মের গভীরে ঐশী ভাবের উচ্ছ্বাস !
ভাবই সত্য। মনে বদ্ধ ; মুক্ত মোরা মনে ;
মন নিয়ে সব। সেই মনের জীবনে
আনিল বসন্ত তব অপূর্ব বাঁশরী !
যৌবনের অঙ্গে অঙ্গে তুমি দিলে ভরি'
চলার দুর্বার বেগ ! অনন্তের ক্ষুধা
মিটায়েছে তব বেণু-রাগিণীর সুধা !
জুড়ায়েছ কান আর প্রাণের পিপাসা !
কোটি মৌন কণ্ঠে, কবি, তুমি দিলে ভাষা !

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে
অমিয় চক্রবর্তী

সেই পুরাতন জ্যোতি—
ধ্যানশিল্পী জানান প্রণতি।
—যস্তদ্বেদ স বেদ—
চেতনা উদয় অন্তহীন
হৃদয়ে ধরেন সমাসীন।
প্রকাশিত সূর্য কোটি লোকে,
উদ্ভাসিত দেখেন আলোকে।

—সকৃৎ, উপাস্য, দৈব জ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি।
প্রতিদিন জাগ্রত সম্বিৎ
দেখেন সংসারে ব্রহ্মবিদ্‌।

কবি-প্রণাম

করুণার সৃষ্টিকাজে শেষে
এ জন্মের পারে এসে
মৃত্যুলোক পার হ'ন প্রাণে,
—মৃত্যোরাত্মনং পরিহরানীতি—
জ্যোতির আহ্বানে
পৃথিবীতে তাঁর
এই কাব্য দীপ্তিধারণার।

তুমি সেই কবি
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনের ছড়ানো পাপড়িরে একত্রে দেখিতে যে পায়,
তুমি সেই কবি।
কালের বঙ্কিম রেখা চিত্ত-পটে যে জন ফুটায়,
তুমি সেই কবি।
দুঃখেতে যে জনা হাসে, সুখ যার মনেরে কাঁদায়,
তুমি সেই কবি।
যে নিজ অন্তরমাঝে টেনে নেয় নিখিল ধরায়,
তুমি সেই কবি।
যে রসের রূপের দ্বন্দ্ব ঘোচায় সৃষ্টি-লীলায় অবাধে,
তুমি সেই কবি।
আকাশ ও ধরার বিচিত্র সুর একই ছন্দেতে যে বাঁধে,
তুমি সেই কবি।
বিপ্লবের রক্তমেঘে মহাকাল-ইঙ্গিত যে খোঁজে,
তুমি সেই কবি।

কবি-প্রণাম

কোন্ সূত্রে বিশ্ব-প্রাণ বিধৃত যে তাহা বোঝে,
তুমি সেই কবি।
আমাদের রবি ॥

তুমি আর আমি

মনোজ বসু

তোমার কবিতা পড়িতেছি ব'সে, আর ভাবি মনে মনে—
তুমি যেন সুগোপনে
হাওয়ার মতন টিপি টিপি পায় আসিয়াছ মোর পাশ,
চোখ না চাহিয়া বেশ বুঝিতেছি মৃদুতম নিঃশ্বাস।
নয়নেতে যেন আঙুল বুলালে, সব হ'ল সোনামাখা,
ঘর ছেড়ে মন গুঞ্জনি' নীল আকাশে মেলিল পাখা।
ছেঁড়া মাদুরেতে আসিয়া বসিলে ঘেঁষাঘেঁষি গা'য় গা'য়,
চারি পাশ দিয়ে মিনিট-ঘন্টা পলকে উড়িয়া যায়
সামনে কবিতা বই—
তুমি আর আমি গলাগলি হ'য়ে মন খুলে কথা কই।

চোখ তুলে' দেখি, নিখিল ছুটেছে ফুল-চন্দন-হাতে,
মনে মনে হাসি! যাহারে খুঁজিস, সে যে হেথা মোর সাথে।
আলপনা-আঁকা মাটির দেয়াল, দোরে ধান-মঞ্জরী,
মোরা দু'জনায় মৌন আলাপ ছোট্ট ঘরটি ভরি',
—নাই কোন কলরব,
ভারি মজা লাগে,—বাহিরের ওরা ডাকিয়া মরুক সব!
এই যে বসেছি গোপনে দু'জনে ছেঁড়া মাদুরের কোণে,
তুমি যাইবে না, যতই ডাকুক,—ঠিক জানি মনে মনে,
—আজি নও আর কারো,
সারা মনে মোর তোমার কবিতা—পালাও কেমনে পারো।

কবি

প্রমথনাথ বিশী

আমরাও তোমারি মতন
সুখে সুখী
দুঃখে দুঃখী
মর্মতলে প্রদীপ্ত বেদন
করি অনুভব।
যবে অভিনব
জাগেরে দক্ষিণ বায়ু প্রান্তরের ভালে
মোদের শিরীষ-শাখা কাঁপে সেই তালে,
মোরাও উচ্ছ্বসি' উঠি
নিরুদ্ধ এ চিত্ত টুটি
বাহিরায় লাবণ্য-ক্রন্দন,
আঁখিপ্রান্তে সজল স্পন্দন।
আমরাও তোমারি মতন।
তবু হায় হেরি,
সে ক্রন্দন, সে সোহাগ,
রজনীর ইতিবৃত্তে দীপ্ত মর্মরাগ
সে শুধু মোদেরি
শুধু আমাদেরি।
সুখ দুঃখ লভি'
গড়িলে কঙ্কণ তুমি
গড়িলে অঙ্গদ
একার যা ছিল তব করিলে সম্পদ,
সকলের।
সুখ দুঃখ লভি'

কবি-প্রণাম

তুলিলে সঙ্গীত করি'
ফুটায়ে তুলিলে ধরি'
আপনার বৃন্তটির 'পরে
স্তরে স্তরে
আনন্দের অনিন্দ্য কুসুম
বেদনার অবদান,
প্রাণ, গান, দান
অমর্ত্য কুঙ্কুম
তুমি কবি, তাই তুমি কবি।

পঁচিশে বৈশাখ

কাদের নওয়াজ

বাংলার কবি, ভারতের কবি, বিশ্বের কবি তুমি,
গঙ্গা-যমুনা কল্লোলে বহে তোমার চরণ চুমি'।
প্রকৃতি-রাণীরে দেখিয়াছ কবি, শুনিয়াছ তারি বাণী,
সোনার থালায় 'নৈবেদ্য' যে ভারতীরে দেছ আনি।
'শিউলি-বনের পাশে পাশে' আর, 'শিশিরেতে ভেজা ঘাসে',
অরুণ-রাঙানো পা-দুটি তোমার পূজে সবে উল্লাসে।
শেলির কাব্য-চাতকের সম 'বলাকা' তোমার ঊর্ধ্বে রয়,
ধরার কলুষ-কালিমার রাশি, পরশে না কভু তার হৃদয়।
সাজাহান তাঁর মমতাজ লাগি' গিয়াছেন রচি' তাজ উজল,
তুমি রচিয়াছ কাব্য-কাননে তারো চেয়ে বড় 'তাজমহল'।
'গগনে গরজে' জলভরা মেঘ, তটিনীতে তব 'সোনার তরী'—
ঐ ভাসিতেছে,—'সোনার ধানেতে' বক্ষ তাহার গিয়াছে ভরি।

'ধরণী যে লিপি পড়ে বারে বারে', সে লিপি লিখেছ তুমিই জানি,
'পাশে এসে সে যে বসেছিল' তব—শ্বেত-শতদল-বাসিনী বাণী।
মেঠোপল্লীর প্রান্তেতে বসি' ভুলিয়া দুঃখ বেদনা সবি,
এ দীন পাঠায় প্রাণের অর্ঘ্য, লহ সম্রাট বিশ্ব-কবি।

হে আদিত্য বৈতালিক
মণীশ ঘটক

আমরা দেখেছি যারা জলস্তম্ভ জাগে স্পর্ধি' তরঙ্গনিগ্রহ,
দেখেছি শার্দূলশৃঙ্গে গৌরীশঙ্করের ভালে দীপ্ত সূর্যোদয়,
নৈশসুপ্তিশেষে নিত্য নব নব কুসুমের জন্ম-পরিগ্রহ,
সেই আমাদেরও কাছে তব আবির্ভাব বন্ধু, পরম বিস্ময়।

আমরা দেখেছি যারা সঞ্চরণশীল সৃষ্টি, কাল বহমান,
জেনেছি গতির নৃত্য তবু বাঁধা ছন্দোবন্ধে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে।
মৃত্তিকার রসপুষ্ট চিত্ত নবোন্মেষ লভি' চির ভ্রাম্যমাণ,
তব ধ্যানে হে মহান্, ধ্বনিত সে দিব্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ নিস্বনে।

আমরা শুনেছি যারা, সম্বোধি' অমৃতপুত্রে উদাত্ত আহ্বান,
শুনেছি স্ব-কক্ষ 'পরে লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমা-গান।
পশে কানে অনাগত অনিবার্য বিধ্বংসের অস্ফুট নিনাদ,
জানি আছে তারও পরে নবতর সৃজনের পরম প্রসাদ।

শুনেছি তোমার কণ্ঠে, হে আদিত্য বৈতালিক, প্রাণোন্মাদন
জীবনের জয়ধ্বনি, মৃত্যুস্নানে শুচিস্মিত সুনিত্য জীবন।

কবির জন্মদিনে

সুনির্মল বসু

যে রবি উদিয়াছিল বঙ্গের গগনে—
কোন্ এক শুভ সে লগনে,
দীপ্তি তার তৃপ্তি দিল জগৎবাসীরে ;
আঁধার নাশিল ধীরে ধীরে—
জগতের যত ভ্রান্তি, যত শ্রান্তি, যত ক্লান্তি আছে,
বিদূরিতে আবির্ভাব হ'ল যেন আমাদের কাছে।
পরম-প্রকাশ সেই কেহ জানে, কেহ জানিল না,
সে-অশ্রুত শক্তি-মন্ত্র কেহ মানে, কেহ মানিল না।
তবু সেই দীপ্ত-রবি, স্বয়ং প্রকাশে
যুগান্তের অন্ধকার নাশে,—
মন্ত্র দেয় কবি—
সৃজন-গরবী।

রবি-ছবি দিবাভাগে চির-অধিকারী ;
রবি-কবি দিবা-রাত্র আঁধার বিদারি'
ছড়ায় আলোক-ছটা, জ্যোতির্ময় দ্যুতি—
সৃজনের অপূর্ব-বিভূতি।
আজো মনে গর্ব জাগে,—আমাদের দেশের মাটিতে
জন্মেছিল মহাকবি,—এ আকাশ ভরেছিল গীতে,
এ-বাতাস নিয়েছিল আপনার নিশ্বাসের সনে,
প্রতিদিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
এই আলো দেখেছিল নয়ন ভরিয়া,
কত ছন্দে নেচেছিল আনন্দ করিয়া।
সে মহা-ঋষির মন্ত্রে কত জন অমা-রাত্রিশেষে
সোনার কাঠির স্পর্শে জেগেছিল হেসে।

কত দুঃখী-ব্যথাতুর, চেতনা-হারারা
আনন্দের পেয়েছিল সাড়া,
জাগরণী গানে
কত শান্তি, তৃপ্তি পেলো প্রাণে।
আজ রবি অস্তগত দিগন্তের মেঘে,
সৃজনের মর্ম-কথা আজো আছে জেগে
তোমার আমার প্রাণে, তোমার আমার সুখে-দুখে,
আজো সে সৃষ্টির সিন্ধু উথলিছে সবার সম্মুখে ;
গান কর, পান কর, স্নান কর, সে সমুদ্র-মাঝে,
অন্তর্হিত স্রষ্টা আজ সৃষ্টিতে বিরাজে
অনুদিন ধরি',—
আজি জন্মদিনে তাঁরে প্রণিপাত করি।

রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

কণ্ঠ তোমার পার হ'য়ে গেল
সাত সমুদ্র তেরো নদী
চীন হ'তে পেরু গেল সে কণ্ঠ
মেরু হ'তে মেরু সীমাবধি।
সেই কণ্ঠ কি স্থির হ'তে পারে
শতবর্ষের তটদেশে!
শতকের পর শতক পেরোবে
সাত সমুদ্র তেরো নদী।
হারাতে হারাতে যাবে সে কণ্ঠ
মিলাতে মিলাতে ভেসে ভেসে,

তবু সে কণ্ঠ পার হ'য়ে যাবে
যুগ হ'তে যুগ নিরবধি।

পঁচিশে বৈশাখ

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জাগে
পঁচিশে বৈশাখ। বাজে শাঁখ
বৈশাখী সমীরে,
উষার উদয়-রাগে
ডাকে
বিহগেরা জীবনের তীরে
আজিকে তোমারে।
যেথায় পূরবী তুমি গেয়েছিলে সন্ধ্যাতটে বসি',
সেথা তব জন্মদিনে আশাবরী উঠেছে বিকশি'
তটিনীর সুরে সুরে-সংসারের প্রভাতের পারে।

জন্ম নিল নিখিলের উদয়-ভারতী
হে সূর্য-সারথি !
এই দেশে, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত দেশে
তব জনমের মহাকাব্যের উন্মেষে ;
দেবতার হে শ্রেষ্ঠ বিভূতি !
এই দিনে আবির্ভাবে তব, ওঠে শত স্তবস্তুতি
সংসারের নানা দিকে,
বিস্মিত করিয়া চির অনন্ত পথিকে !
ভারতের সভ্যতার সংস্কৃতির সর্বোত্তম বাণী
তুমি ছিলে গুরুদেব ! প্রবাহিণী হ'ল যে পাষাণী ;

মুঞ্জরিল শুষ্কতরু তব উদয়নে ;
সেই কথা পড়ে মনে !

সারস্বত কলস্বনা বহমান করে গেছ কবি !
তারি গান বাজে
সপ্তর্ষিমণ্ডল মাঝে
অপাবৃণু রবি !
লোকে লোকে পরিক্রমা তব চির সৃষ্টি-আবর্তনে
হে সুন্দর ! ভুবনে ভুবনে
কালের অদৃশ্য চক্রে পদধ্বনি শুনি তব পরম বিস্ময়ে ;
যুগ-যুগান্তের স্তরে বহে তব ভাবধারা কত অভ্যুদয়ে,
কত পরিচয়ে
অমৃতের বার্তা লয়ে
আসে তব জন্মতিথি বর্ষে বর্ষে এমনি বৈশাখে,
প্রণাম তোমারে কবি, প্রণাম তোমাকে।

স্বপ্নশেষ

কানাই সামন্ত

আকাশনিমগ্ন এই ধরণীর ঘাটে
সুরের তরণী বেয়ে তরঙ্গের নাটে
স্বপ্নের উজান খরস্রোতে
ভেসে এসেছিনু দূর ভবিষ্যৎ হ'তে—
দূর, অতি দূর।...
তরঙ্গের সাথে

অভিসারী তরঙ্গ-আঘাতে
গান হ'য়ে উচ্ছ্বসিল সুর,
নামহারা পরিচয়হীন অদৃশ্য বন্ধুর
রচিল আসনখানি শতলক্ষ-দলে
বিকশিত দিব্য-শতদলে
মুহূর্তের তরে।···
মুহূর্ত অন্তরে
কী মন্ত্র পড়িল জাদুকর,
তাই তারে অশীতিবৎসর
ব'লে ভ্রম হয়—
বাল্যজরা-হর্ষশোক-আশাশঙ্কাময়
অতি দীর্ঘকাল।···
সেই গৃহ, এই সে সকাল,
যেখানে মর্ত্যের মুগ্ধ আলো
মুহূর্তে বেসেছি আমি ভালো,
মুহূর্তে নিয়েছি টেনে হৃদয়ে আমার
এ বিশ্বসংসার।···
জীবনের চলচ্চিত্রমালা
শেষবার দেখা দেয় ছায়ারৌদ্র-ঢালা
স্বপ্নময় স্বরূপে তাহার।
দেখা দেয় শেষবার
তরণী ফেরার মুখে
আঁখির সম্মুখে
বিদ্যুতের গতি।···
দূরে, অতি
দূরান্তরে, পৃথিবীর নব নব দেশে
ফিরেছি পথিকবেশে

সত্য-শিব-সুন্দরের বাণীবহ দূত ।
পুণ্যবেদী করিয়া প্রস্তুত
নিখিলমিলনযজ্ঞে নিখিলের ডাক
দিয়েছি । নির্বাক
ভীরুরে দিয়েছি ভাষা । জন্মকাল হ'তে
যারা অন্ধ সেজেছিল, অপূর্ব আলোতে
মেলেছে নয়ন ।...

নিঃসঙ্গ যখন
কেটেছে দিবস-রাত্রি, উদার আকাশে
শুকতারা, সন্ধ্যাতারা ; তারই প্রতিভাসে
মৃদুমন্দ কলকলে
প্রবাহিত শান্ত নদীজলে ।....

একমুষ্টি মল্লিকামুকুল
সুগন্ধি বকুল
উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে
অধরা-অধরস্পর্শ সেধে
উতলা কৈশোর ।...

বাল্যকাল মোর
স্বর্ণপিঞ্জরের বন্দী, সবুজের নীলের গহনে
বনের পাখিরে হেরি আপনার মনে
বিষাদ-বিধুর, বোবা হরষে চকিত ।...
ক্ষণমাত্র হয়েছে প্রতীত
অশীতিবর্ষের এ জীবন ; নামে রূপে
পরিচয়ে রয়েছে আবৃত ।...

চুপে চুপে
নাম রূপ দেশ কাল-রচিত নির্মোকে

অন্তরে মোচন করি' অন্তর আলোকে
মোহমুক্ত চোখে
আপনারে হেরিলাম এই
অপূর্ব নূতন ; নেই
নাম রূপ পরিচয় তার ; মুহূর্তেই
মর্ত্যধূলি ছুঁয়েছিল, মুহূর্তেক পরে
আবার ফিরিল ঘরে।···

চিরদূর রহস্যের স্বপ্ন ছোঁয় ব'লে
ধরণীর ধূলি-তৃণেতে কুসুম দোলে,
জড় পায় প্রাণ,
আকাশ আলোক বায়ু গেয়ে ওঠে গান,
অমৃত অপরিমাণ
ভরি' দেয় পরিমিত এ মরজীবন।···
হে পূষন্,
উজ্জ্বলন জ্যোতির্লোকে করো উদ্ঘাটন
হিরণ্ময় দ্বার।
স্বপ্নশেষ যাত্রাশেষ হয়েছে আমার।
সে পুরুষ হেরিতেছি আমি
আমারই অন্তরে, যিনি তব অন্তর্যামী

পূজা দিব বলি' গিয়াছিনু রাজপুরে

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে রাজা, তোমারে পূজা দিব বলি' গিয়াছিনু রাজপুরে
একদা সে এক মাধবী নিশায় মুগ্ধ বাঁশীর সুরে।
অচেনা বিদেশী গিয়াছিনু মিশি' বিপুল জনস্রোতে ;
কত না অর্ঘ্য এনেছিল সবে দূর-দূরান্ত হ'তে !
যে যা' দিল পূজা তুমি দিলে তারে তার শতগুণ দান ;
কত না কুসুম, কত কাঞ্চন, কত হাসি, কত গান !
কত জনে পেল কিরণ-কিরীটী, কত জন মণিহার !
রিক্ত পথিক দূর হ'তে শুধু জানানু নমস্কার।
আমার দিবার কিছু ছিল নাকো, তাই সঙ্কোচে সরি'
সবার পিছনে দাঁড়ায়ে দেখিনু তোমারে নয়ন ভরি'।
ধরণীতে যেথা যা কিছু উদার, যা কিছু মহত্তম,
তাই লয়ে তুমি উদিলে প্রথম নবীন জীবনে মম।
পূজার মন্ত্র মুখে আসিল না, ফেলিলাম ভালবেসে ;
প্রার্থনাবাণী লাজে ম'রে গেল কণ্ঠের কাছে এসে।
সভাশেষে সবে ফিরিল যখন ল'য়ে সুর, ল'য়ে কথা—
আমি এনু ফিরি' দুই চোখে ভরি' দৃষ্টির বিশালতা।

আজি বলে সবে, এসেছে আদেশ—শুভদিন-উৎসবে,
সেদিন নিশীথে কে কি লয়েছিনু, হিসাব দেখাতে হবে।
হিসাবের কথা কিছু মনে নাই—সব হ'য়ে গেছে ভুল।
বৈশাখী প্রাতে কাঁটা হ'ল কত চৈত্ররাতের ফুল !
তবুও হিসাব না দেখালে নয়—সুকঠিন পরোয়ানা !
পাতি পাতি ক'রে খুঁজিতেছি তাই সারা অন্তরখানা।
অনেক কিছুই এসেছে গিয়েছে বাহিরের দরজায় ;

ভিতরে যে আছে—মেলার মানুষে কেমনে দেখাব তায় ?
তোমার দানের শত সম্ভার শিরে বহি' দলে দলে
ধরার জনতা দাঁড়াইবে যবে উৎসব-সভাতলে,—
কে কি পেল তারি কথা ল'য়ে সবে মাতিবে বাদানুবাদে,
ফাটিবে আকাশ কোটি কণ্ঠের সুবিপুল জয়নাদে,—
সেদিন সেথায় কেমনে দেখাব রিক্ত আমার হাত,
কেমনে বলিব "চাহি নাই,—শুধু করিয়াছি প্রণিপাত !"
সেদিন কেমনে কাহারে বুঝাব ভাগ্যবানের ভিড়ে—
আমি যা পেয়েছি, গহনে গোপনে, আছে তা বক্ষোনীড়ে !
মোর পানে আজ যে চাহিবে চাহ' কুঞ্চিত করি' ভুরু !
সবাই লভেছে রাজার প্রসাদ, আমি লভিয়াছি গুরু ।

প্রণাম

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যাঁর মাঝে মূর্ত হ'ল মানুষের অমৃত পিপাসা,
তাঁহারে প্রণাম ।
প্রাণের নিগূঢ় ছন্দ যাঁর কণ্ঠে পেল নিজ ভাষা,
তাঁহারে প্রণাম ।
যাঁর চোখে হেরিলাম এ নিখিল সব মধুময়,
তাঁহারে প্রণাম ।
যাঁর সৃষ্টিলোক হ'তে তরঙ্গিত নিয়ত বিস্ময়,
তাঁহারে প্রণাম ।
ভূমার ধেয়ানে যাঁর এক হ'ল নিকট ও দূর,
তাঁহারে প্রণাম ।
বাণী যাঁর বজ্রগর্ভ তবু বন-মর্মর-মধুর,
তাঁহারে প্রণাম ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বহু শত বর্ষ ধরি' পঁচিশে বৈশাখ
অনাগত মানুষেরে দিয়ে যাবে ডাক,
নিয়ে যাবে প্রতিভার আলোক বিভ্রমে
জীবন-মৃত্যুর মহাসাগর-সঙ্গমে,
সেখানে দেখিবে তা'রা রবির উদয়
আজি প্রভাতের মত তেমনি বিস্ময় !
মোরা তাঁর পেয়েছিনু পদধূলি-কণা
জীবন-থলিতে তাই হ'য়ে আছে সোনা।

আজি তব জন্মদিনে হে কবি-সম্রাট,
শুনিতেছি পৃথিবীর প্রাণমন্ত্র-পাঠ—
নূতন সভ্যতা আর মানুষ নূতন
ঘরে ঘরে উড়াইবে বিজয়কেতন,
এ শোষণ, এ লাঞ্ছনা, মৃত্যু আর নয়,
এত দ্বেষ, এত হিংসা, যুদ্ধ আর ক্ষয়
শেষ হবে একদিন, সেই মহাবাণী
তোমার কবিতা মাঝে পেয়েছিনু জানি।
তব জন্মদিনে এই আশীর্বাদ ল'য়ে
বাহিরিব জীবনের নয়া দিগ্বিজয়ে।

কবির জন্মদিনে

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন ভোরে—
আকাশ তখনো ভরেনি আলোয় ভালো কোরে—
ঘুম গেলো ভাঙি, দূর হ'তে শুনি
জন্মদিনের উল্লাস-ধ্বনি,
চলেছে বৈতালিকের দল
রবিপন্থী আলোক-কুশলীসকল ;
নখর তখনো হয়নি সবিতা,
প্রখর মুখর সরব জনতা—
চোখ মেলি চাই,
পদাবলীর প্রসাদ দেখি কোথাও পড়ে নাই।

সেদিন প্রভাতে—
মাল্য-চন্দন হাতে—
স্নান সেরে, গান গেয়ে, ভ'রে নিয়ে সাজি
শালপ্রাংশু মহাভুজে প্রণাম নিবেদিতে আজি
চলেছি আসরে বাসরে স্মরণের উৎসবে
প্রধানগণের নিবেদন বোধন গৌরবে
কতো মন্ত্র হ'ল পাঠ, কতো গীত হ'ল গাওয়া
ভাষণের শাসনে প্রশস্তিতে চাওয়া
শুধু হ'ল না ধ্যানেতে তোমার উদ্দীপন,
চেতনায় এলে না জীবনে জীবন করিতে উজ্জীবন।

সেদিন দুপুরে
ঘরে ঘরে বেতারেতে সুর যখন বাজে নূপুরে

দ্রুত-ঝঙ্কৃত কথায়
মত্ত দিগন্ত কবির জয় গায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি নীলকণ্ঠ পাখী লাগি'
কান পেতে রই সেই তান তরে, যা উঠিবে জাগি'।
রৌদ্রছায়ার মিথুন মায়ায় আকাশে অবকাশে
সোহিনীর ইতিহাসে পরজ বিভাসে,
তবুও সেথায় তুমি দিলে নাকো দরশন
পেলাম না কবির মৃদু স্নেহশীল পরশন।

সেদিন সন্ধ্যায়—
সান্দ্র রবির আবেশরঞ্জিত বর্ণান্ধ বন্ধ্যায়
চলেছি তোমার নামে লাঞ্ছিত সভাতে
যদি কিছু পাই নব পরিচয় যা পাইনি প্রভাতে ;
যদি তোমার নাট্যশালায়
নৃত্যগীতের আলোকমালায়
ধরিত্রীর আরত্রিক ওঠে ভেসে
মহাকালের মদির মন্দ্রে হেসে
সেখানেও দেখা মিলিল না হায়, সেই অমুক্ত অঙ্গনে—
মনে হ'ল যেন চকিতে গেলে তুমি চলে তোমার ঐ শালবনে।

সেদিন গভীর রাতে
আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে বিধাতার হাতে,
শর্বরীর বর্বর অভিনয়
লুপ্ত করে মানুষের বিশেষ পরিচয়,
সুপ্তিময় ইঙ্গিতে দেখি তোমার আসন পাতা,
কিশোর এক দীপ জ্বালায়, কিশোরীর নত মাথা

জানে না ভাষা, আয়োজন কম প্রকাশভঙ্গী হীন,
মরমে আছে মিনতি শুধু, গানের সুর ক্ষীণ,
সেইখানে বারে বারে মনে হয়
তোমার পায়ের ধ্বনি শুনিলাম, যা গিয়াছে জগৎময়।

শতাব্দী হতে শতাব্দী
সৈয়দ মুজতবা আলী

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে, কী ক'রে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভাবিল। পরাধীন, দীন, দগ্ধভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গকবি হ'ল বিশ্বকবি!
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি' মানিবে বিস্ময়
কোন্ পুণ্যবলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!!

শতাব্দীর প্রণাম
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শতাব্দী ঘুমায়ঃ
অবলুপ্ত সহস্র শতক
দিনান্তের স্নিগ্ধ ছায়াতলে।
মহাকাল ভৈরবের পিঙ্গল জটায়
ঘুমায় শিথিল সূর্যঃ
লক্ষ শত পরিক্রমা—

উদয়গিরির অরুণিমা
মিশে যায় রক্তিম সন্ধ্যায়,
প্রদোষের অন্ধকারে ঃ
নামে যবনিকা।

স্মিতমুখে চায় অরুন্ধতী ;
সপ্তর্ষির কানাকানি
ভেসে আসে নিশীথ-পবনে।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
রাত্রিরে ঘিরিয়া
দিনের এ আসা-যাওয়া মহা-মহোৎসব ঃ
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন লক্ষ আবর্তন ঃ
মুছে যায় বিস্মৃতির কোলে।

চৈত্র-সন্ধ্যা আসে বার বার,
ঝ'রে পড়ে আবির-পলাশ
ধূসর ধূলায়, পৃথিবীর উত্তপ্ত পঞ্জরে।
জাগে কৃষ্ণচূড়া !

শালবনে লাগে রঙ—বৈশাখের খরসূর্যতাপে।
দিন আসে, দিন চলে যায়
বৈশাখের আয়ু হয় শেষ।

বর্ষে বর্ষে শতাব্দী ফুরায়,
তবু জাগে মানুষের চিত্তলোকে চির অনিমেষ—
সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা ঃ তুচ্ছ করি নিত্য আনাগোনা ঃ
সোনার অক্ষরে লেখা
বৈশাখের পঞ্চবিংশ দিন।
হে কবি, মানস-সূর্য !

মানুষের তীর্থ হ'ল সেই মহাক্ষণ।
…পুণ্য তব নাম!
সহস্র শতক মাঝে, পুণ্য তিথি পঁচিশে বৈশাখে
শতাব্দীর রহিল প্রণাম।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

হেমচন্দ্র বাগচী

মোরা বলি, 'আর কেন ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর
নবযুগ-মধুচ্ছন্দ! মধ্যাহ্নের হ'ল অবসান;
ছায়া হ'ল দীর্ঘতর; পূরবীতে যে করুণ তান,
বাজিছে কম্পিত সুরে, তারো শেষ; গাঢ় কণ্ঠস্বর!'
মোরা বলি, 'কোথা গাও ?—নগরীর বিলাস-সাগর
ভুলিছে কি তব সুরে? কিংবা কোথা সে বলিষ্ঠ প্রাণ—
যে ধরিবে বজ্রকণ্ঠে পরিত্যক্ত তোমার বিষাণ ?
ছায়া এল; কেন আর ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর।'

দূর হ'তে কারা কহে, 'নহে, নহে আরো কিছুকাল!
না ফুরাতে শেষ রশ্মি গোধূলির অস্ফুট প্রবাহে,
কবি! তুমি ক্লান্ত করে লেখনীর শেষ রক্তদানে
ঘুচাও এ মৃত্যু-তৃষা! ওই দুটি নয়ন বিশাল
না মুদিতে, স্পর্শে তার স্নিগ্ধ করো বিশ্বের প্রদাহে।
জীবন রচিব মোরা মৃত্যুঞ্জয়ী তোমার ও গানে!'

রবীন্দ্রনাথ

শিবরাম চক্রবর্তী

কে জানে রহস্য এই, তোমারি স্বপন
নব নব রূপ নিল—নদী-গিরি-বন !
তব গোপনতা তার মহিমা বাড়ালো,
সবুজেরে ঘাস বলি, বলি না এ আলো ।
যে-অঙ্কুর তোলে আজ উদ্ধত অঙ্গুলি
তোমা পানে স্পর্ধাভরে, গিয়াছে সে ভুলি'
তব আলোকের সে যে নব রূপান্তর ।
যে-মেঘেরে উচ্চে তোলো দিয়ে নিজ কর
তোমারে ঢাকিতে চায় তাহার আবেগ ;
বিনিময়ে হাসো তুমি ; দম্ভ-কালো মেঘ
রঙে রঙে হেসে ওঠে সে হাসির সাথে ।
তোমার রঙীন ধনু হেরি তারি হাতে ॥

কবি

অজয় ভট্টাচার্য

পাথরের পুতুল আমরা,
প্রাণের প্রাচুর্য কত দিবে কবি ঘুচাইতে যুগান্তের জরা ?
এ সূর্যের পীত পিণ্ড ঘিরে আছে নাগরীয় ধূম্র-অজগর,
অরণ্যের নীল স্বপ্নে স্বপ্নায়িত করিবে কি লোহিত নগর ?
রামগিরি-অলকার পান্থ মেঘ জম্বুছায়া আনিয়াছ তুমি,
উজ্জয়িনী হল বুঝি কল্পরূপে আমাদের তৃষ্ণা-মরুভূমি !
প্রদগ্ধ কন্টক-বনে কুরুবক-কিংশুকের এ কি অভিযান—
আমাদের রুদ্ধ কর্ণে পশে সপ্ত-সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত গান !

মনে হয় পারি বুঝি ভুলে-যাওয়া ফুল-বাস ফিরায়ে আনিতে,
কবেকার কানে কানে ডাকা নাম আজো পারি ডাকিতে নিভৃতে।
হায় কবি অবন্ধন চেতনায় পাষাণের ঘুম দিলে ভাঙি—
শতাব্দীর ক্লেদে কালি মন্দারের বর্ণ-রাগে উঠিয়াছে রাঙি।
বড় ছোট, পুরাতন এ পৃথিবী—আমরা যে মহাপক্ষ পাখি,
কেন চিনাইলে কবি, ছিনু ভাল ছিনু বন্দী নষ্টনীড়ে থাকি॥

শতাব্দীর নমস্কার
শিলাদিত্য

নম নম মহাকবি,
বাংলা ভাষার জীবন আলোক দীপ্ত উজল রবি।
কবিরূপে তুমি তিমিরহরণ,
বঙ্গবাণীর করিলে বোধন,
ছন্দে ছন্দে রচিলে কাব্য ভারতের নব ছবি।
নম নম মহাকবি।

নম নম নটরাজ,
জাতির জীবন-রঙ্গযজ্ঞে মনোহর তব সাজ
সেই মঞ্চে ফুটালে 'রক্তকরবী',
'মুক্তধারা'-র শুনালে পূরবী,
'অচলায়তন' করিয়া চূর্ণ ভাঙিলে মিথ্যা লাজ।
নম নম নটরাজ।

নম নম মহামতি,
তোমার 'বলাকা' শিখাল ভারতে ছন্দশুদ্ধ গতি।

'গীতাঞ্জলি'-তে দেখেছি বিকাশ,
জ্ঞানের অরুণ আলোক প্রকাশ,
দেখেছি কেমনে 'নৈবেদ্য' সাজায় বাক্যের মিনতি।
নম নম মহামতি।

নম নম সুরকার,
'জন-গণ-মন' চেতনকারী নব সুর ঝংকার।
নৃত্যের গতি তালে 'সোনার তরী'
এনেছে 'খেয়া'তে নদী পার করি,
'চৈতালি' গান 'গীতালি' বিতান কেতকী মাল্যহার।
নম নম সুরকার।

নম নম জ্ঞানময়,
গুরুদেবরূপে তুমি যে আচার্য কীর্তিতে অক্ষয়।
তোমার স্থাপিত নৈমিষ-অরণ্য
বাণীর নিবাস জগৎ-বরেণ্য
'বিশ্বভারতী' যেথায় তিমির নিত্য করিছে ক্ষয়।
নম নম জ্ঞানময়।

নম মহামহীয়ান,
পৃথ্বী করিছে সন্নত শিরে শ্রীচরণে মান দান।
নব ভারতের কবি কালিদাস,
বিস্ময় বিশ্বের তোমার প্রকাশ,
তোমার গর্বে গরব করিয়া ভারতের সম্মান।
নম মহামহীয়ান।

নম চিত্ত চমৎকার,
শতাব্দী জেনেছে আজ কিবা তব পূজা উপাচার।

তোমার পরশে ধন্য সেই কাল,
তোমারি চন্দনে উজলিত ভাল,
তব স্মৃতিতলে আছে মাত্র তার এক উপহার
শতাব্দীর নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ
হুমায়ুন কবির

প্রভাতের দীপ্ত রবি রজনীর নিঃশব্দ গহন
তিমির উদ্ভাসি,
পূর্বাকাশপ্রান্তে যবে আঁকে তারা রক্ত-আলিম্পন,
আলোকের জয়গানে নিখিল ভুবন ওঠে হাসি।
অন্ধকার শিহরিয়া দূরান্তরে সভয়ে মিলায়,
জীবন চঞ্চলি ওঠে নৃত্যশীল আনন্দ-লীলায়,
কুঞ্জে ফোটে পুষ্প রাশি রাশি।

হে কবি, আলোকরথে পূর্ব হতে পশ্চিম গগনে
যাত্রাপথ তব,
বিশ্ববিজয়িনী তব প্রতিভার প্রদীপ্ত কিরণে
বিমুগ্ধ ভুবন আনে পদতলে অর্ঘ্য নব নব।
পূরব পশ্চিম আজি ভুলিয়াছে প্রাচীন কলহ
তোমার বিজয়-গান নভোপানে ওঠে অহরহ
আনন্দ-উছল কলরব!

জীবন-প্রভাতে কবে যাত্রা তুমি করেছিলে কবি
আশার আলোকে,
সংসার সংঘাত লাগি চিত্তে তব জাগে যত ছবি
অমর প্রতিমা গড়ি রূপ তারে দিলে মর্ত্যলোকে।

শরৎ-আকাশতলে অপরূপ আলোক-উৎসব,
বসন্ত-পূর্ণিমা-রাতে মোহময় গীতি-কলরব
উচ্ছ্বসিল প্রকাশ-পুলকে।

স্বচ্ছ লঘু মেঘ সম যে স্বপন অন্তর-আকাশে
ভেসে যায় চলে
যে আকাঙ্ক্ষা অগ্নিগর্ভ গিরিসম বিদ্যুৎ বিকাশে
জ্বালাময় শিখা মেলি সুগভীর অন্তরের তলে,—
স্বপন-বিলাসী চিত্তে রচে তব বিরামবিহীন
সে আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়া সঙ্গীতের সুধা নিশিদিন
কভু হাসি কভু অশ্রুজলে।

নিখিল অন্তরমাঝে জাগে যেই দুর্বার আবেগ
গভীর ক্রন্দন,
পর্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
ভেসে যেতে নভস্তলে ছিন্ন করি মাটির বন্ধন।
সুদূর গগন পারে কায়াহীন আকাঙ্ক্ষার ভরে
অনন্ত আলোক মাগি তৃপ্তিহারা অন্তর গুমরে।
খুঁজে ফিরে আশার নন্দন।

তোমার জাগ্রত আত্মা ছড়াইল দিক্ দিগন্তরে
যে অমৃতবাণী,
নিখিল মানব-চিত্ত সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ভরে,
বরণ করিল তারে সঞ্জীবনী প্রেমমন্ত্র জানি।
তোমার অন্তরমাঝে অসীম খুঁজিয়া ফেরে সীমা,
তিমির উজলি তোলে মানবের বিপুল মহিমা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত আলোরশ্মি হানি।

প্রভাত-সঙ্গীত গাহি আনন্দের উচ্চরোল তুলি
বাহিরিলে পথে,
যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল রজনী দিনগুলি
মানসীর লাগি তব সাজাইলে অন্তর আলোতে।
ক্ষণিকের পরশনে ভাসিল সোনার তরীখানি
খেয়াঘাটে বসি তব চিত্ত ভরি উচ্ছ্বসিল বাণী
সঙ্গীতের স্বপ্ন-সুধা-স্রোতে।

পূরবীর ছন্দে আজি রবির গভীর বীণা বাজে
ক্লান্ত সুগম্ভীর,
আসন্ন বিরহ-ব্যথা মেঘমায়া রচে চিত্তমাঝে,
নয়নের কোণে ঝোলে মুক্তাবিন্দুসম অশ্রুনীর।
সে অশ্রুমালিকা কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরণীতে
তোমার অমর আত্মা যৌবনের বিজয়-সঙ্গীতে
জাগাইবে মূর্ছনা মদির।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

বুদ্ধদেব বসু

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম ! সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়।
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙ্গীনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়'।
দেশে দেশে, সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরো থরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ গান স্তব্ধ ; ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ-দুঃসহ ঘৃণা—
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু যদি না
লিপ্ত হ'ত রক্তে মোর বিদ্ধ হ'ত গূঢ় মর্ম্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র ! অন্তরে লভেছি তব বাণী,
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরি জয় হবে, জানি।

চিরচেনা

আশাপূর্ণা দেবী

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়।"
আমার জীবনে একথা সত্য নয়।
আর এও নয় সত্য,
"হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে—"
ঝলমলিয়েছে চিত্ত !

ছিল নাতো ঘর,
ছিল না কোথাও দ্বার।
তোমারই উদার প্রাঙ্গণতলে ঠাঁই ছিল খেলিবার।
সেই খোলা প্রাঙ্গণে
অবোধ প্রাণের নির্ভয় নিয়ে খেলিয়াছি আনমনে।
সেখানে আকাশ অকৃপণ হাতে
ঢেলেছে আলোর সোনা,
খেলা ছিল সেই ঝলমলে রঙে
স্বপ্নের জাল বোনা।

ছিলে না কখন,
এসেছ কখন,
জানিনে তাহার দিশে,
জানি, জীবনের অণুতে অণুতে
তুমি রহিয়াছো মিশে,
চেতনারও আগে হ'তে।
দিন হ'তে দিনে চলিয়াছি ভেসে
সেই আলোকের স্রোতে।

তুলিনি প্রশ্ন,
খুঁজিনি তোমার মানে,
এপাড়া ওপাড়া ছুটিনি কখনো তত্ত্বের সন্ধানে।
আছি তা'রই কাছাকাছি,
দূর-শৈশবে যেখানে প্রথম খেলাঘর রচিয়াছি।

পণ্ডিতজনে—
বুদ্ধি-মশাল জ্বেলে,
তোমারে চেনাতে আসে কত শত ব্যাখ্যার জাল ফেলে।
চেয়ে চেয়ে দেখি—
নুড়ি দিয়ে দিয়ে হিমাচল পরিচয়।
মহাসাগরের পরিমাপ করে—
অঞ্জলি সঞ্চয়।
যেন ফুল চিরে ফুলের অর্থ খোঁজা।
অনির্বচনে—
বচনের ফাঁদে ক'রে নিতে চাওয়া সোজা।
মোর আনন্দ
না বোঝা সুখের অফুরান বিস্ময়ে;
চির রহস্য আছ চিরদিন চির আশ্রয় হ'য়ে॥

প্রণাম

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

রবির কিরণ লাগি'
　　যে নির্ঝর জাগিল সহসা,
পাষাণের বক্ষ টুটি'
　　চূর্ণি কারা, নাশিয়া তমসা—
সে তো আর নহে আজি
　　ক্ষণদেহা শীর্ণা তপস্বিনী,
সে যে আজ পূর্ণরূপা
　　খরস্রোতা নটিনী তটিনী,
সিন্ধুপ্রিয়া মহানদী—
　　কূলে তার কত জনপদ,
কত শ্যাম শস্যক্ষেত্র
　　তারি স্নেহে রচিছে সম্পদ ;
সেদিনের রবি-ঋণ
　　বুঝি আজ শেষ হল তার।
অথবা করিল ঋণী
　　টুটি' স্বপ্ন নাশিয়া আঁধার
আরো বহু রুদ্ধ স্রোতে ;
　　সে হিসাব নাই রাখিলাম।
সবচেয়ে ঋণী যেবা—
　　সে পল্বল রাখিল প্রণাম,
দূর হতে সসঙ্কোচে।
　　ঋণ শোধা সাধ্য নয় তার,
ঋণী সে যে—এই গর্ব
　　সর্বাধিক সাধনা তাহার।

রবীন্দ্রনাথ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কালবৈশাখীর কালো ঝড়ে
অন্ধকার হ'য়ে গেল পঁচিশে বৈশাখ।
আমি ঘরে ব'সে তার শুনি যেন ডাক
শুনি এক রুদ্র নাচে তাণ্ডবের নাচ—
তাকে স্বয়ম্বরে
ডাকছে কে—যাবে কি সে—সে যে আত্মভোলা।

নিজেকে ভুলেছি আমি, দেখি রুগ্‌ণ গাছ
কাতর প্রার্থনা করে, আমি আছি বেঁচে
মরুক নিসর্গ আজ তার প্রাণ যেচে,
আমি আর মরব না ভাবি।

সব স্বপ্ন থাকে যেন তোলা,
কল্পনার সব-কিছু দাবী
পড়ে থাকে ঝড়ের সম্মুখে।
এ ঝড় তোমার দৃঢ় বুকে
ছিল ত রবীন্দ্রনাথ—তাই
আমি শুনি ওই ঝড়ে জন্মের সানাই।

সঞ্চয়িতা

প্রণব রায়

ছকে-বাঁধা দিনগুলি আসে আর যায়
জীবনের ধূসর আকাশে,
ক্লান্ত মনের পাখি পাখা ঝাপটায়
মাঝে মাঝে সুদূর পিয়াসে।

ছোট লাভ, ছোট লোভ, স্বার্থ দিয়ে ঘেরা
প্রত্যহের জীবন-সংগ্রাম,
সকালে অফিসে ছোটা, সন্ধ্যায় ফেরা—
তুনিয়ায় বাঁচা এরই নাম !
মনে হয় কেন আছি ? কি দাম বাঁচার ?
দিন বুঝি হবে না রঙিন,
ভুলেও ফাগুন বুঝি আসিবে না আর,
বাজিবে না বাঁশি কোনোদিন ॥

তবু যবে মাঝে মাঝে শ্রান্ত অবসরে
খুলে বসি 'সঞ্চয়িতা'খানি
আমার এ একতলা বুক-চাপা ঘরে
নীলাকাশ দেয় হাতছানি ।
কোথা হ'তে বাঁশি বাজে বড় মিঠা সুরে,
প্রাণে লাগে পলাশের নেশা,
পুরানো মধুর নামে ডাকি যে বধূরে,
চোখে তা'র কী আবেশ মেশা !
প্রত্যহের লাভ-ক্ষতি সব ভুলে যাই,
এ জীবন লাগে বড় প্রিয় ;
তুমি যে রয়েছ কবি, পৃথিবীতে তাই
ভালোবাসা মরেনি আজিও ॥

পঁচিশে বৈশাখ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পঁচিশে বৈশাখ।
ভোরবেলা গান শুনি রবীন্দ্রনাথের।
সুরের ছোঁয়ায়
মনের নিভৃত কান্না ফুল হ'য়ে ঝরে,
উদ্দাম উত্তপ্ত তৃষ্ণা তারা হ'য়ে দিগন্তে হারায়।
ঘুমন্ত স্বপ্নেরা
দলে দলে পাখা মেলে উড়ে চ'লে যায়,
গ্রাম মাঠ বন পার হ'য়ে,
পার হ'য়ে দগ্ধদীর্ণ আরক্ত খোয়াই,
কোপাইয়ের কৃশ তীর,
আম আমলকি শাল মহুয়ার প্রসন্ন ছায়ার,
ভুবন-ডাঙার বুকে
অফুরন্ত সবুজে সবুজ
যেখানে গানের নীড়!
খুঁজে পায় আত্মার আশ্রয়,
সমস্ত কামনা যৌবনের
একটি ক্ষণেক শোনা গানে!

২৫শে বৈশাখ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শরীরী সমুদ্র তুমি, মানবিক চিন্তা-পারাবার
মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা তব তেজোময় প্রচণ্ড দুর্বার,
স্বদেশের পরম গৌরব। একাশীতি বৈশাখ-প্রান্তে

হে স্থবির বাণীমূর্তি, পৃথ্বী যবে যান্ত্রিক আঘাতে
বিধ্বস্ত ভয়ার্ত অসহায়,
—তব তীব্র প্রতিবাদ—
পর-রাজ্য লুব্ধদের ভর্ৎসিতে তোমার সিংহনাদ
আজো তুমি কৃষ্ণমেঘে বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মত
বিদগ্ধ মানব-মনে আজো তুমি বর্ষিছ নিয়ত
অফুরন্ত অমৃত নির্ঝর ! হে ঋষি হে মহাপ্রাণ,
একাশীতি বৎসরে লহ ভারতের সভক্তি প্রণাম ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভবানী মুখোপাধ্যায়

ক্লান্ত ম্লান দিবসের পরে
পশিলাম ধুলি-ধূম-ধূসরিত ঘরে ।
এ জীবন লাগিছে বিস্বাদ,
দেহ-মনে কত অবসাদ ।

সুমুখের টেবলের ধারে
বসে আছে সারে সারে,
আরো কত অভাগার দল,
তাদেরো প্রাণের গতি নহেক চঞ্চল ।
চায়ের কাপের সাথে কথা ভরপুর,
তারি মাঝে শুনিলাম—রবীন্দ্র ঠাকুর ।

শীতের শীতল সন্ধ্যা নামিয়াছে ধীরে—
আকাশের রবি নামে অস্তাচল-তীরে ।

হেথা ছোট দোকানের মাঝে,
নামিলেন সাঁঝে
মরতের মরকত রবি
দূর হ'ল ক্লান্তি জ্বালা সবি।

দেখিলাম জ্যোতির্ময় ছবি—
আমার আঁখির আগে ঋষি কবি রবি।
স্নেহ-স্পর্শে লভি' আশীর্বাদ
ধন্য হ'ল জীবনের সাধ।
অন্তরেতে গুঞ্জি' উঠে সুর
রবীন্দ্র ঠাকুর।

তারপর—
ধীরে ধীরে,
আবার জগতে এনু ফিরে
তোমার ছবির নীচে মাথা ঠেকালাম,
হয়ত তোমার কাছে পৌঁছিল প্রণাম

রবীন্দ্রনাথ

করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের তুমি বিস্ময় আজ ওগো ভারতের দীক্ষাগুরু,
জীবনের পথে চলিবার কালে প্রণমি তোমায় যাত্রা শুরু।
হে বাউল কবি, ওগো সুন্দর, অপূর্ব তব কাব্যধারা
জাগাল মোদের নিদ্রিত প্রাণ গঙ্গা-যমুনা আপন হারা—
বাণীর দেউলে আরতির তব দীপ্ত আলোক জ্বলিছে আজ,
হে মরমী কবি, তব পূরবীর সুরে ভরিয়াছে ভুবন-সাঁঝ।

তোমার ধ্যানের কমল ফুটেছে শান্তির মাঝে যে নিকেতনে—
সুরভি তাহার নিখিল ভরেছে বাতাসে জাগিছে ক্ষণে ক্ষণে,
তোমার প্রেমের বাণীতে প্রেমিক পেয়েছে জীবনে নবীন বল,
তোমার করুণ বিরহের গাথা বিরহী জীবনে সে সম্বল।
বর্ষার রূপ তোমার নয়নে নবীন রূপে যে দিয়েছে ধরা,
বসন্ত-প্রাতে তব বসন্ত-সঙ্গীতে হোক ভুবন ভরা।

আকাশ তোমার বন্ধু হে কবি, সাগরের সাথে মিতালী তব।
ঝড়ের রাতে ও দুর্যোগ-দিনে অভিসার তব নিত্য নব।
বিশ্বমানব ধ্যানরত আজ কবিগুরু হেরি তোমার মাঝে—
মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হেরি যে তোমার মাঝারে রাজে—
অস্তরবির রশ্মি আভায় রাঙায়েছে আজ দিগ্‌বিদিক—
বিস্ময় রাজে জগতের মাঝে চেয়ে আছে সবে নির্নিমিখ।

হে আত্মভোলা, ওগো কবি-রবি, তব আরতির সান্ধ্যক্ষণে—
নিবেদিনু মোর ভকতি প্রণাম তব উদ্দেশে আজি এ দিনে॥

পঁচিশে বৈশাখ
দক্ষিণারঞ্জন বসু

দেয়ালে টাঙানো ফটো
দেরাজে পুস্তক,
অন্তরে কথার ফুলে আঁকা যত
কবিতার ছক।

মহুয়া-মাতাল সন্ধ্যা কিংবা
কোনো সহাস্য সকাল,
কিরণ প্রাখর্যে ক্রমে যেই দিন
হ'য়ে ওঠে ভীষণ ভয়াল।

খরতাপ-দগ্ধ তবু ভালো লাগে
বৈশাখী দুপুর ;
আরো ভালো অকস্মাৎ শুনি যদি
বৃষ্টির নূপুর।

কাননে কান্তারে শ্রী অপূর্ব শরৎ
নিঃসন্দেহ বটে,
হেমন্তের নবান্নের মধুমতী
ধান মাঠে মাঠে।

শাখার শিখরে গাছে পাখিদের
বাসন্তী আলাপ,
আকাশে ও মৃত্তিকায় কী মধুর
প্রসন্ন উত্তাপ।

অথবা শীতের রোদে মুখরিত
অঙ্গন প্রাঙ্গণ
নতুন আশার স্বপন প্রাণে প্রাণে
তোলে শিহরন।

যথার্থই লাগে ভালো এসব কিছুই—
কিন্তু কেন জানি ;
তার মতো কোন কিছু নয় যেন
সত্য বলে মানি।

একটি জন্মের সাথে একই লগ্নে
এ বিশ্বেরও নবজন্ম লাভ,
প্রকৃতি ও জীবলোকে একই সঙ্গে
সে-নামের তাই এ প্রভাব।

ভাষা পেয়ে মূক বাঙ্ময় তাই—
দুর্বল বলীয়ান,
দিকে দিকে তাই আনন্দ আর
সৃষ্টির জয়গান।
আশা তাই সীমাহীন ;
মানব-জাতির অপরিশোধ্য
এ যেন মাতৃঋণ !
নিরবধি কাল যাত্রায় তার স্মরণ্য
অক্ষয় সেই ক্ষণ,
সে পরম প্রশান্ত মুহূর্তে
সংস্কৃতি সমুদ্রে স্নান হ'য়ে ওঠে
অসংখ্য জীবন।
অত্যুজ্জ্বল পঁচিশে বৈশাখ ঃ
যত ভাবি ততই অবাক !
সে দিন স্মরণে
পৃথিবীর মানুষের নত নমস্কার
যুগে যুগে লোকে লোকে
জমা হ'য়ে থাক।

রবিঠাকুর

কুমারেশ ঘোষ

রবি ঠাকুর ; আশ্চর্য, তুমি নাকি প্রবন্ধ লিখতে ?
শুনি, তোমার নাকি অনেক প্রবন্ধের বই আছে !
—প্রফেসারী করতে ?
তুমি নাকি ইংরেজের হিজলী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে

মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে বিনা মাইকেই
খুব জোর বক্তৃতা দিয়েছিলে ? অবাক কাণ্ড তো ?
আর তুমি নাকি জালিয়ানওয়ালাবাগে
ইংরেজের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে
ত্যাগ করেছিলে তোমার নাইট উপাধি ?—কী বোকামি !
আবার ভারতের বিরুদ্ধে
কোন বিদেশী বা বিদেশিনী কুৎসা প্রচার করলে
তোমার মধুবর্ষী লেখনী নাকি দুর্বলের কঠোর লাঠি হ'য়ে দাঁড়াতো ?
—খুব মজার তো ?

তাছাড়া এ'ও শুনি, মহাত্মা গান্ধী নাকি তোমাকে
গুরুদেব বলতেন ! গুরুগিরিও করতে !
আরো শুনি, তুমি গাছতলায় ব'সে ছেলেমেয়েদের পড়াতে ?
—খুবই গরীব ছিলে বুঝি ?
তাদের হাতের কাজ শেখাতে ?—বাবা ; এতও জানতে !
এবং নাকি উপরি উপায়ের জন্যে
শেখাতে নাচ-গান অভিনয় !—আশ্চর্য !
আবার ব্যবসাও করতে নাকি ?—বইয়ের ব্যবসা ?
তার মানে বুড়ো হাড়ে তুমি
সে যুগে স্রেফ ভেল্কী দেখাতে !
তাইতো আজকে তোমাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ !
তোমার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব করছি !!!

টেলিগ্রাম

সুশীল রায়

'চার কুড়ি সম্পূর্ণ নয়, পাঁচ কুড়ি পূর্ণ করা চাই।'
সকালে উঠেই হাতে দৈনিক পেলাম,
সেবাগ্রাম হতে দেখি শুভ টেলিগ্রাম।
তদুত্তর নিচে লেখা, তা-ও পড়িলাম ঃ
'পাঁচকুড়ি বেয়াদপি, সহ্যাতীত চার-কুড়িটাই।'
চৌদিকে বিষম যুদ্ধ ঃ মানুষে মানুষে হাতাহাতি—
এরি মাঝে, হে মনীষী, তোমাদের এত মাতামাতি ?
বাক্‌যুদ্ধে কে-যে পটু—বুঝিতে তা পারিনি অদ্যাপি
তোমরা-যে দু'জনেই নিদারুণ কথার জিলাপি।
তবু তুমি, হে রবীন্দ্র, মনোরাজ্য করিয়াছ মাত
তোমার তাঁহার মাঝে সর্বশেষে এই তো তফাত।
তুমি শত্রুহীন, তাই দ্বন্দ্বে নাই তোমার আরাম
এখানে অশীতিতম বর্ষশেষে শ্রদ্ধা রাখিলাম।

রবীন্দ্রনাথের নব-মূল্যায়ন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ কিরীট ! কিংবা তার চেয়ে যদি ধরো অন্য কিছু হয়,
সে-উপমা নিতে পারো কিংবা আরো, অন্য কিছু আরো—
সে-অর্থের দ্যোতনাই আমাদের মনে আজো অধৃষ্য বিস্ময় !
সে-বিস্ময়ে চিরদিন অবলীলাভরে শুধু মুগ্ধ হ'তে পারো।
মহাসমুদ্রের তল ? তার যত গভীরতা, তারই শেষ সীমা—
ছোঁয়া যায় কখনো কি ? আকাশের শূন্য যায় মুঠি দিয়ে ধরা ?

দূরত্বের অণিমায় মিছে তব খর্ব করা সে-গুরু মহিমা।
অতএব শুধু স্তব—এই হ'ল অতিভক্ত যুক্তি পরম্পরা।

এর বেশি আমাদের কিছু কি করার নেই, নতুন নিরিখে ?
যে-সমস্ত দিকে, দেশে, রথ তাঁর থেমে গেছে, এগোয়নি আর—
যেথা তিনি ব্যর্থকাম, সগৌরবে সে কথাও থাকে থাক টিঁকে !
যে-সমস্ত অন্ধি-সন্ধি পায়নিকো জাদুস্পর্শ তাঁর প্রতিভার।
অতল জলের আহ্বানরূপে আত্মা তাঁর বলে দিকে দিকে—
দূর থেকে পূজা নয়, কাছে এনে এইবার ছাখো তো কবিকে।

পাহাড়, আকাশ, কাল

হরপ্রসাদ মিত্র

বাংলায় বা বড়োজোর ভারতেই সামান্য নিবাস,
কে কার খবর রাখে, হাসি-ঠাট্টা, মরণ-মারণ,
দিনের শাকান্নপ্রার্থী, অহরহ তাতেই যন্ত্রণা—
কিছু বটে দেহসুখ, কিছু স্বপ্ন, সুষুপ্তি কিছু-বা—
হঠাৎ সে সমতলে দেখা দেয় পাহাড়ের ছবি,
হঠাৎ পুষ্পিত হয় নামহারা কতো যে প্রান্তর !

কিছু যে বাজবার আছে এই সব গভীর দৃশ্যেতে,
পাহাড়ে কুসুম জ্বলে গাঢ় লাল,—আর, এই আমি—
কী এক বিশাল সত্য সে-প্রহরে হয় অনুভব।

হৃদয়, শুনছো কিছু ? বাজে কিছু ? কিছু কি বাজে না ?
নিজেকে জাগাও, দেখো, এ পাহাড়ে নিজেকেই ডাকো—
ওঠো তুমি, জাগো তুমি, শোনো তুমি সমুদ্রের গান।

যেখানে নিত্যই থাকা, সে সামান্য সংসার-শিয়রে
পঁচিশে বৈশাখ আনে আকাশের, কালের রাখাল।

কবি-প্রণাম

গোপাল ভৌমিক

জীবন বিচিত্র। তার চেয়ে বিচিত্র মানুষ
পৃথিবীতে বাঁচে মরে, গান গায়,
হাসে কাঁদে, ওড়ায় ফানুস
অনির্দেশ্য শূন্য পথে ঃ
হিমালয় স্বপ্ন কারও,
কারও স্বপ্ন সমুদ্র স্বনন,
কি বিচিত্র মেধা ও মনন।

অলস মধ্যাহ্নে বসে এ মানুষই ফের
টেনে চলে ইতিবৃত্ত, অতীতের জের
অনাগত জীবনের প্রশান্ত প্রাঙ্গণে ;
ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে, বসে বসে গোণে
রাত্রি শেষ, দিন শুরু,
অবিচ্ছিন্ন কাল সঞ্চরণে।

এ মহাপ্রবাহে যত ক্ষতি, গতি, উত্থান-পতন,
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ভালবাসা শত প্রয়োজন,
রূপকল্পে প্রাণ দিলে,
সংবেদনে দিলে নব ভাষা ঃ
একের প্রাণের মন্ত্রে উচ্চারিত
সহস্রের আশা।
শ্যাম শস্যে ভরা মাঠ, হিমালয়, সমুদ্রের স্বাদ
তুমি এনে দিলে প্রাণে,
গানে দিলে জীবন-জিজ্ঞাসা,
অপ্রমেয় সুর্যের স্বভাষা।

বিস্ময়ে অবাক মানি, প্রণাম জানাই—
তুমি ছিলে, তাই আছি আমরা সবাই।

রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হে কবি, তোমার রক্তশিখায় দিগন্ত-বনলেখা
চেয়ে দেখি আজ অস্ত আভায় ধরে অপরূপ বেশ
আলোর আড়ালে তুমি যে গিয়েছ নামি ;
ধূসর আকাশ-তলে
পৃথিবী জুড়িয়া মরা মানুষের মিছিল চলেছে হেথা
পাণ্ডুর চাঁদ ধীরে দেখা দেয় শ্মশানে বাবুল-শিরে
ক্ষীণালোকে তার ধূসর মিছিল—মাটিতে পড়ে না ছায়া।
মাটিতে পড়ে না ছায়া ঃ
প্রদীপের মতো কবে নিভে গেছে ম্লান আত্মার শিখা
মোটরের তলে জমাট রক্ত কালো পীচ হয়ে ওঠে
ফেরো কংক্রিটে মিশেছে হাড়ের গুঁড়া।
রণ-প্রাঙ্গণে লোলুপ-রসনা, দিতেছে আত্মবলি
কৃষ্ণ সাগরে কৃষ্ণ-মৃত্যু নামে,
তুষার ঝরণে ফিকে হয়ে এল রক্ত-ইস্তাহার ॥
অস্তপথের হে রবি-পথিক, তোমার ধ্যানের মাঝে
তুমি তো দেখেছ উপলাকীর্ণ দয়াহীন দুর্গমে
রক্ত-নয়ন, সংশয়ভরা মুখ ঃ
পদতলে ভেঙে হাড়ের পাহাড় শোভাযাত্রীরা চলে,
কণ্ঠে তাদের মহামানবের জয়।
দূর-প্রতীচীর তুষার-শিখর ’পরে

কে জাগে ভক্ত পূর্বাশা পারে নয়ন-নির্নিমিখ
মৃত্যুর মাঝে রহিয়াছে যার মরণ সঞ্জীবনী।
তুমি চলে গেছ, হে রবি-পথিক, তোমার আলোকশিখা
আমার আকাশে জ্বলিছে অনির্বাণ ঃ
সে আলোয় দেখি মরা মানুষের মিছিল চলিয়া যায়,
নবজীবনের কোন্ মহাশিশু নব-জাতকের লাগি
'সনাতনম্ এনম্ আহুর, উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ'
তামস-বিজয়ী ইনি সনাতন—নিত্য নবীনতর ॥

রবীন্দ্রনাথ

বিমলচন্দ্র সিংহ

ঘন অশ্রু বাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে অন্ধকারে
রচনাশালায় বসি একা ধাতা চিন্তায় মগন—
সে ঘন তমিস্রা মাঝে দৃষ্টি ফিরে আসে বারে বারে
পথ খুঁজি নাহি মেলে, নাহি জাগে সৃষ্টির স্বপন,
আঁধার গভীর হল, কোথা যায় উষার সন্ধান ?
মৃত্যুর এ নীরবতা ভেদি কোথা প্রাণ-কলরব ?
নবীন সৃষ্টির তরে মিছে শুধু ব্যাকুলিত প্রাণ,
শিবের জটায় গঙ্গা সুপ্ত আজি নিশ্চিন্ত নীরব।
এমনি কাটিল কাল অবশেষে ধাতার অন্তরে
ফুটিল অরুণ আলো, সে আলোয় তমঃ গেলো ভাসি,
সে বিভায় ধীরে ধীরে অনন্ত অম্বর গেলো ভরে,
আলোর অরুণ-রাগে চিত্তস্থল উঠিল উদ্ভাসি' ;
সে আলোয় বহ্নিবীণা বিশ্ব ভরি উঠিল ঝঙ্কারি,

সে আলোয় উচ্ছ্বলিল দিকে দিকে জাহ্নবী-প্রবাহ,
সে আলোয় প্রাণ-বন্যা চিত্তে চিত্তে গেলো যে সঞ্চারি—
আলোর চুম্বনে জাগে প্রাণে প্রাণে শান্তিহীন দাহ,
সে আলোর কেন্দ্রে জাগে জ্যোতির কনক-পথখানি,
অজস্র সৌরভে জাগে, জাগে সে যে অনন্ত বিভায়—
দীপ্ত স্বর্ণ-শতদলে ঝলকিত তাহার যে বাণী
হে কনকপদ্ম আজি নমস্কার জানাই তোমায় ॥

তোমার শরণ নিই

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জীবন-পরিচর্যার পথ আজ রুদ্ধ।
দুর্বুদ্ধির বাজ হনন করেছে হরিৎ স্নেহ—
দানবের মূঢ়তায় ও হিংসার আক্রোশে
ছিঁড়ে-খুঁড়ে উন্মূল করেছে নীল নীলা-পদ্ম,
নৈরাশ্যের লাঞ্ছনা ও আত্ম-অবিশ্বাসে
প্রাণকে হারাতে বসেছি, বিচ্ছিন্ন সুর
তাই, আজ তোমাকে স্মরণ করি, রবীন্দ্র ঠাকুর !

মানুষকে দিয়েছো তুমি অমৃত আস্বাদ,—
মানুষই দেবতা বলে তুমি ত' শেখালে !
দস্যুর নিষ্ঠুর শাপে যতই কাতর হই আজ,
তোমাকে আঁকড়ে ধরি !
যত হানাহানি, হার, আঘাত, অন্যায়,
ততই তোমার কাছে অমৃতের দীক্ষা যাচি—
শুচিশীলন যে আদর্শ তোমার !

আমরা মানুষ ব'লে করেছো ঘোষণা তুমি
জীবনের পদ্মকে তুমি স্নেহে প্রেমে করেছো মধুর !
তাই ত' এ বিপর্যয়ে তোমার শরণ নিই—
রবীন্দ্র ঠাকুর !

তীর্থঙ্কর

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যুগ হ'তে কত যুগান্তরে
ইতিহাস কাটে দাগ বিচিত্র অক্ষরে।
আসে যাত্রিদল : শুরু হয় বেচাকেনা—
সম্ভারের নানা বিপনিকা :
কখন অলক্ষ্যে আসি নামে যবনিকা।

বাদল, বসন্ত কভু, কভু দেখি প্রলয়ের ঝড়
ছন্দে তালে ঘটে রূপান্তর।
সমৃদ্ধ দেউলে
লাগে ঘুণ প্রতি পলে পলে।

কত যে মহেন্‌জদড়ো তক্ষশিলা কত
ছিল মুখরিত—স্বর্ণ-শীর্ষ সভ্যতা ঘোষণে ;
দেখি এইখনে
আক্ষরিক অবশিষ্ট লাইনের 'পরে
ইতিবৃত্ত উঁকি দেয় সময়ের অতীত স্বাক্ষরে।
নূতনের সৃষ্টি শুরু হয়,
আর কিছু গড়ে তোলে আর এক সময়।

বৈপ্লবিক অবশেষ নব পলিমাটি
স্মৃতির দেউল গড়ে কত যত্নে কত পরিপাটী।
ভাঙে আরবার,
আরবার মুমূর্ষুর ভিড়
সভ্যতা দেউলে হয়—জমে ওঠা শত শতাব্দীর

তবু শুনি, শুনি সেই সুমহান স্বর ঃ
উপল বন্ধুর পথে
যুগে যুগে আসে তীর্থঙ্কর।

পৃথিবী ভাঙার দিনে
গোবিন্দ চক্রবর্তী

পৃথিবী ভাঙার দিনে—
মহতের প্রতি তবু দৃঢ় শ্রদ্ধা থাক্।
হে হৃদয়—দেখ, দেখ—
আজও আসে পঁচিশে বৈশাখ।
এ-দিনে যে জন্মেছেন রবীন্দ্র ঠাকুর ঃ
সে অর্থ বিস্তৃত, জেনো, আরো বহুদূর ;
এ নয় নিতান্ত জন্মদিন,
ভারতের যে-ঐতিহ্য শাশ্বত প্রাচীন—
এ যে তার আরবার মূর্ত উচ্চারণ ঃ
এ-দিন ছড়ায় মৃত শ্মশানে জীবন।

না, না—কোনো নাম নয় এ রবীন্দ্রনাথ।
মহাপুণ্য, মহাশুচি,

আত্মার অমেয় রুচি
মানুষের ইতিহাসে—সভ্যতার অম্লান প্রভাত।
ভারতবর্ষের হিমালয়—
জানিনাক হয় কি না হয়
আর তার অন্য কোনো
অনন্য অন্বয়!

পৃথিবী ভাঙার দিনে—
পড়ুক যেখানে যত মালিন্যের দাগ,
হে হৃদয়—দেখ, দেখ—
কি উজ্জ্বল তবু এ বৈশাখ!
এ তিথির প্রীতি হ'তে নাও দীপ্তি, দিশা—
পথ ছেড়ে সরে যাক দীর্ঘ অমানিশা।
ভাঙুক রুদ্রের মহাধ্যান—
নোয়াক বিষাক্ত ফণা ক্রূর অকল্যাণ;
শুধু এই হিরণ্ময় মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি ঃ
লালন করাও এক প্রসন্ন সুকৃতি।

সঙ্গী সঙ্গীত
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তবু কিছু শান্তি, এই দুর্দিনের মেঘের আড়ালে
সুবর্ণ-সূর্যের ছটা ঝিলিমিলি আশ্বাসে হঠাৎ
ভেসে ওঠে। মনে হয় এই অন্ধ ভয়ে-ভরা রাত
সমস্ত দুঃস্বপ্ন নিয়ে মুছে যাবে। সারাক্ষণ আর
জীবনের শত্রু তার পথে পথে সর্বনাশা জালে
শিকার খুঁজবে না। যেন প্রত্যুষের আশীর্বাদ নিয়ে

দুঃসহ গ্লানির শেষে ভেসে এল সুরের ঝঙ্কার
মাতালের উচ্ছৃঙ্খল অসংবৃত প্রলাপ থামিয়ে।

অথচ এ শুধু আশা। বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন যত
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে, জানি আমি ; এই ত্রস্ত প্রাণে
আবার নামবে রাত্রি, তা-ও জানি ; সবুজ ময়দানে
ছিঁড়ে যাবে ঘাসের জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে
হৃদয় হলুদ হবে।
—তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে, নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে!

তাই আজ আমারো বিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
তাই আজ চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

রবীন্দ্রনাথ

সুশীলকুমার গুপ্ত

যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম প্রগাঢ় পরিচয়,
সেদিন কি বার তিথি মনে নেই, শুধু আছে মনে—
আকাশ সমুদ্র বন ডেকেছিল নীল নিমন্ত্রণে,
অমৃতসূর্যের স্বাদে উল্লসিত শিশুর হৃদয়।
এল কত যুদ্ধ, মারী, সভ্যতার বিপন্ন সময়;
তবু সে স্মৃতির দীপ স্নিগ্ধ স্থির প্রাণের গহনে,—
বর্ধমান দ্যুতি তার মৃত্যুভয়—হতাশা-পীড়নে;
দিনে দিনে নবরূপে প্রকাশিত তোমার অভয়।

তোমার ইশারা শ্বেত-সমুদ্রের গভীর কল্লোল,
তোমার স্মরণ কৃষ্ণমেঘে ঝড়-বিদ্যুতের পাখি,
তোমার সঙ্গীত স্বচ্ছ ছায়াপথে নক্ষত্র পথিক।
তোমাকে হৃদয়ে রেখে আনন্দের মুগ্ধ উতরোল,
মরণ-বঁধুর হাতে বাঁধে মন দুঃসাহসী রাখি,
সূর্যের দিগন্তে চলে ঝঞ্ঝাক্রান্ত কালের নাবিক।

তুমিই গভীরে

দুর্গাদাস সরকার

হে রবীন্দ্রনাথ,
আমার বিকৃত রূপে অন্ধকার হাসে অট্টহাসি।
আলোকিত উজ্জ্বল প্রভাত
মুখ তার লুকায় লজ্জায়। আমি তবুও তোমাকে ভালবাসি।
পথচারী ব্যঙ্গ করে বক্র চাহনিতে।
পঙ্গু পা, দু-হাত ভাঙা, দীর্ঘ-দাঁত জন্তুর মতন,
অ-অক্ষর শূন্য বিদ্যা, তবু শান্ত তোমার সঙ্গীতে
আমার গভীরে যেন জেগে ওঠে অন্য এক মন।
মনে হয়, এই পথ এই মাটি শান্তিনিকেতন।

তাই গাছের তলায় ফুটপাতে একা
আমি ভিক্ষাজীবী ছোট চকখড়ি দিয়ে ঘষে নাম
লিখতে চাই 'রবীন্দ্র ঠাকুর'। তার সুর-দীপ্তি দেখা
যায় না বাইরে, কিংবা বিকৃত রূপের অঙ্গে
নেই তার দাম ;

অন্তরে অন্তরে তবু চিরন্তন জন্মের ভেতরে
রূপ তার ধরা দেয় দেহান্তরে ; হে রবীন্দ্রনাথ,
পথভ্রষ্টা জননীর কোমল জঠরে
যে শিশুর হয় আবির্ভাব
অঙ্গে তার নামে চিরসুন্দরের আলোর প্রপাত।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

দেখেছি ভোরের সূর্য সাত-রঙে রাঙায় আকাশ,
দৈনন্দিনে আনে বরাভয়, আনে প্রবল আশ্বাস ;
গ্লানিমুক্ত চেতনার রৌদ্রস্নাত নবজাগরণে
শুচিস্মিতা ঊষা যেন, চোখ মেলে এ-জীবন মুক্ত পূর্বাচলে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ কোন্ স্বপ্নের ভুবনে।

জ্যোতির কনক-পদ্মে দেখি আমি তোমাকেই কবি
বহ্নিবীণা বক্ষে নিয়ে দীপ্ত কেশে উদ্বোধনী বাণী—
মগ্ন সদা সুন্দরের ধ্যানে,
একমনে রচে যাও সুরে সুরে ইন্দ্রধনুচ্ছবি
বিচিত্র লীলায় ; নিত্য স্বদেশের, দশের সম্মানে
ন্যায়নিষ্ঠ, অবিচল প্রতিবাদে কখনো মুখর
অন্যায়ের অসত্যের পঙ্ক হতে ঊর্ধ্বে স্বচ্ছ আকাশে ভাস্বর
বাঁধো এই জীবনের ধ্রুবপদ, মেলাও বিশ্বের ঐকতানে
কর্মীর প্রেরণা আর প্রেমিকের নিভৃত গুঞ্জনে।

শতবর্ষ আগে কিংবা শতবর্ষ পরে
একই আনন্দধারা বহে যায় এ ভুবনে প্রহরে প্রহরে।
আমার আকাশে কবি অগ্নিবাষ্পময়
সৃষ্টির আবেগে তুমি স্পন্দমান দীপ্ত নীহারিকা,
কত সূর্য জন্ম নেয়-আবর্তিত তোমাতে বাঙ্ময় !

পঁচিশে বৈশাখ জ্বলে, বোধিদীপ্ত অনির্বাণ শিখা।

সংগীত

জয়তু

অতুলপ্রসাদ সেন

জয়তু, জয়তু, জয়তু কবি,
জয়তু পূরব-উজল রবি।
জয় জগত-বিজয়ী কবি,
জয় ভারত-গৌরব-রবি,
বঙ্গ-মাতার দুলাল 'রবি'
জয় হে কবি !

হে কবি ! তোমার মোহন তান,
নিখিল জনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি' তোমার দান,
আজি গরবী
হে বিশ্ব-কবি !

কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদু মধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেম-বিধুর,
বিচিত্র কবি !

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও,
সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও,
হে বীর কবি,
দেশ-প্রেমী কবি !

বিশ্বের উদার সমতলে,
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশ-কালের ভেদ ভুলিলে
কি নব ছবি !
হে কর্ম্মী কবি !

বিশ্বেশ্বরের চরণ-তলে
তব গীত-গঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে,
হে দেব-কবি !

রবীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সপ্ত-সুরের সপ্ত-ঘোড়া চালায় যেজন ইঙ্গিতে,
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে !
রাগ-রাগিণীর রশ্মিটানে
বাণী নিয়ে বশ্য মানে
সুরের রাজা—যার অপরূপ ভঙ্গীতে—
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে।

যাহার করের পরশ পেয়ে কমল ফুটে আনন্দে,
ভুবন ভরে নূতন বাণীর সুগন্ধে ;
বঙ্গদেশের সেই কবিরে—
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে
কে পারে আর কথার রঙে রঙ্গিতে—
তারে কে আর কথা শোনায় সঙ্গীতে।

সুর ও কথা অবাক হয়ে হার মেনে তাই তার কাছে,
চোখের জলে প্রসাদ-সুধা-ধার যাচে ;
ঐ চরণের যোগ্য করি'
অর্পিতে আজ অর্ঘ্য ভরি'
চিত্ত-সাগর রয় শুধু তরঙ্গিতে—
কথা ও সুর তাই ভেসে যায় সঙ্গীতে !

গান

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে,
তার তরে আজ গান খুঁজে পাই কোনখানে গো কোনখানে !
অবাক দেখি এ মোর হৃদয়,
ভাষাও সে যে হল নিদয়,
হতাশ হয়ে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে—
উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে।
তোমার ছাড়া গান কি আছে !
গাইব কি আর তোমার কাছে !
তোমার সুরে যাই যে ভেসে, মন উতলা সেই টানে—
তোমার তরে গান খুঁজে পাই কোনখানে গো কোনখানে।
বিশ্বহৃদয় জয় করেছ জগৎজয়ী হে কবি !
পূর্ণ হল শূন্য জীবন সে গৌরবে গৌরবী।
জগৎ জুড়ে তাই তো শুনি
তোমার গুণের গান যে গুণী !
সেই সুরে আজ সুর মিলিয়ে গাইতে হবে মন মানে
নইলে কোথায় সুর খুঁজে পাই, কোনখানে গো কোনখানে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

নলিনীকান্ত সরকার

তোমার গান বিকোলো প্রাণের দামে
রসিকজনের হাটে,—
সেইখানে ঠাঁই নিল বেছে
সবার হিয়ার পাটে ॥

তরুণ-মনে লাগলো সুরের দোলা,
অকাজের কাজ রইলো ঘরে তোলা
গানের মধু পান ক'রে তার
রাত্রি-দিবস কাটে ॥

পাখীর গানে জাগলো সে সুর
নদীর কলস্বনে,
ফুলের বুকে উঠলো সে সুর
অলির গুঞ্জরণে।

বাদল ধারায় সে সুর পড়ে ঝ'রে,—
হাসির ঝলক ওঠে আকাশ ভ'রে,
কান্তারে প্রান্তরে সে সুর
জাগলো পল্লীবাটে ॥

অরূপ ধরা দিল রূপে
অসীম এল সীমায়,
দূরের বাধা দূর হল যে
সুরের মধুরিমায়।

সে সুর সবায় বক্ষে নিল টানি,
বিশ্বে শোনায় মহাপ্রেমের বাণী,
সারা ভুবন মিললো এসে
ভুবনডাঙার মাঠে ॥

রবি-গীতিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শোনাও গুরু, জগৎ-জোড়া মানবতার গান,
মহা ঋত্বিক, বাজাও বীণায় বিশ্বজনীন তান।
বাংলার কবি, বাংলার রবি
ধরায় বিলায় আলোর ছবি,
যেথায় ছিল তুষার-জরা, সেথায় সবুজ প্রাণ।

পটের পরে যাও বুলিয়ে কল্প-রেখার ছন্দ,
বাজিয়ে নূপুর খোঁজো বাউল, তৃণফুলের গন্ধ।
আকাশ-বাতাস বক্ষে নিয়ে
রূপের ভুবন চক্ষে নিয়ে
চিরজীবী কবির-কবি! অজয় অবদান!

গানে গানে ভরিয়ে দিলে

নির্মলচন্দ্র বড়াল

গানে গানে ভরিয়ে দিলে
বিশ্বভুবন গানের কবি!
সুরের আলো ছড়িয়ে দিলে
ভুবন-তলে ভুবন-রবি!

তোমার আলোয় ভুবন আলো
বেসেছি তাই নিখিল ভালো
মোর নয়ন হতে মুছলো কালো
তোমার পুণ্য প্রসাদ লভি !
গানের কবি ভুবন-রবি
নমি তোমার পুণ্য-ছবি ।

রবীন্দ্রনাথ
দিলীপকুমার রায়

বেদনার ক্ষণফুলে গাঁথিলে পলে পলে
চেতনার অমর মালা, কে কবি, ধরাতলে !
হৃদয়ের শঙ্কা যত
অভয়ের অনাহত
বাণীরূপ সুরে তোমার ফলিল নয়নজলে :
যুগ যুগ সীমার বুকেই অসীমার কান্তি ঝলে ।

অধরার নৃত্যনিঝর ঝরালে কতই তালে !
নিরাশার ক্লান্ত ভালে দুরাশার টিপ পরালে !
বর্ণে গন্ধে গানে
প্রতিভার বরদানে
সাজালে ছন্দ সাজি সুষমার রংমহলে !
এ-জীবন মায়ার খেলা—কে সে বৈরাগী বলে ?

আগুনের পরশমণি হাতে কে নিয়ে এলো
দেবতার দূত ?—নহিলে এত রূপ কোথায় পেলো ?

সুন্দর তারে এসে
বরিল ভালোবেসে
প্রতি তার ছোঁওয়ায়, মরি, অপরূপ তাই উছলে !
যে পারে আপনি পারে ফোটাতে নীলকমলে।

সকলের সঙ্গী হ'য়ে ছিলে অসঙ্গ তুমি ঃ
পঙ্কের বুকে, অমল, উঠিলে তাই কুসুমি'।
করুণের কারাগারে
অরুণের অভিসারে
চলিলে কে গো দলি' মরণে চরণতলে—
প্রতিটি ঝংকারে যার মরু ছায় ফুলে ফলে !

স্বর্গ তুমি গড়িলে কবি
কৃষ্ণধন দে

নিখিল রূপমাধুরী লয়ে স্বর্গ তুমি গড়িলে কবি,
নিখিল ব্যথা রঙিন করে যতনে তুমি আঁকিলে ছবি,
তোমারি গীতি সুধাক্ষরা
নূতন সুরে ভরিল ধরা,
নিখিল চির মানস মধু আনিলে তুমি আহরি' সবি,
মানবমন-গগন-তলে রহিলে চির আসন লভি'।

ব্যাকুল ধরা কাঁদিয়া ওঠে বঞ্চনারি বেদনা-সুরে,
আঁধার যত ঘনাক, তবু উষার আলো নয়কো দূরে,
শোণিত-রঙা করবী ফুলে
কোন্-সে মায়া রাখিলে তুলে,
নূতনতর প্রভাতছটা অস্তাচলে সাজায় রবি,
বাজালে কবি বীণায় তব পূরবী সাথে সে ভৈরবী॥

আমায় তুমি ভুলিয়ে দাও
রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমায় তুমি ভুলিয়ে দাও ভুলিয়ে দাও তোমার স্মৃতি
ভুলিয়ে দাও স্মরণ থেকে তোমার কথা তোমার গীতি।
যে জন যাবে যাবেই চলে
মালা পরাই তারই গলে
শুষ্ক মালার ফুলগুলিরা দেয় যে পীড়া জ্বালা নীতি।
তোমার পাশে বসেছিলাম
তোমায় ভালবেসেছিলাম—
সব হারিয়ে ভাবছি এখন কেন হ'লো পরিচিতি।
কেন চোখে জল যে আসে
সে জল মুছি দেহের বাসে
কোন্ বাসেতে মুছবো আবেশ মুছবো কিসে তোমার প্রীতি!

২৫শে বৈশাখ
রাধারাণী দেবী

বৈশাখী ঝড় উঠলো আবার উঠলো
দীর্ঘ যুগের বন্ধ বাঁধন টুট্‌লো।
ভুলে যা আজ দুঃখদিনের কান্না
আঁধার রাতের আতঙ্ক ভয় আর না,
উল্লাসে সব বাজা বাজা শাঁখ রে
এসেছে আজ পঁচিশে বৈশাখ রে
হৃদয় বিহগ দূর গগনে ছুট্‌লো
দুঃখের পিঁজর টুট্‌লো॥

এদিন মোদের সকল দিনের রাজা রে,
গানের সুরে সুরে এরে সাজা রে।
আনন্দ-ফুল ছড়াও পথে, ঢালো গো,
প্রেমের দীপে দীপালিকা জ্বালো গো,
আজ যে রবির কিরণ-কমল ফুটলো,
সৌরভে যার বিশ্ব-ভ্রমর এই ভারতেই জুটলো
আঁধার অমা টুটলো ॥

পঁচিশে বৈশাখের গান

অখিল নিয়োগী

এলো এলো পঁচিশে বৈশাখ
ডাক দিল প্রাণে-প্রাণে সবাই বাজা শাঁখ !
ভোরের পাখী থাকি থাকি বল্লে খোকা ওঠ্—
পূব আকাশের রঙীন আবীর সবাই এসে লোট !
ওই মলয়ার ফুরফুরে বায় ফুল ফোটে লাখ লাখ—
সবাই বাজা শাঁখ—
এলো এলো পঁচিশে বৈশাখ !

কোকিল ডাকে কুহু তানে ছয়টি ঋতু, আয়—
সবাই মিলে করবি বরণ সময় বয়ে যায়।
শুনবি নদীর কলধ্বনি—
তীরে বসে প্রহর গণি—
নতুন কবি গড়বে এবার আনন্দ-মৌচাক
পাহাড়-সাগর দোলনা দোলায় তাদের তোরা ডাক—
সবাই বাজা শাঁখ—
এলো এলো পঁচিশে বৈশাখ !

রবীন্দ্র-বন্দনা

বাণীকুমার

পূরব গগন জাগ্রত করি
নব উদয়ন-সঙ্গীতে—
দিলে আনি' তুমি প্রাণ-রস-ধারা
বিশ্বে ললিত ভঙ্গীতে।

জগতের যিনি প্রাণময় কবি,
জ্যোতি-রূপে যিনি প্রকাশেন ছবি,
তাঁরি মতো ওহে গৌরব রবি
রহো অপরূপ রঙ্গিতে॥

প্রাচী-দিগন্তে মুখরিত তব
সামগাথা-সম মন্ত্র হে,
নব নব তানে তুলিছে রণিয়া
প্রতীচীর হৃদি-যন্ত্র হে।

খুলে দিলে প্রেমে মহিমার দ্বার,
প্রাণে প্রাণে বহে বাণী-সুধা-ধার,
সব অন্তর-রস-সঞ্চারে
পূর্ণ হে—থাকো নন্দিতে॥

কবি-প্রশস্তি

অমলানন্দ ঘোষাল

বিশ্ববীণার তারে তোমার অন্তরের গান !
ভাসিয়ে দেছ প্রেমের সুরে বিশ্বজন প্রাণ।
অসীমের গোপন বাণী, ধূলার ধরায় দেহ আনি,
নন্দনের মন্দাকিনী তোমার অবদান।
তোমার সুরের সপ্ত ডিঙা ভাসল সাগর জলে,
পূরব 'রবি'র রঙিন আভা পড়ল কূলে কূলে,
দেখ্‌ল জগৎ নয়ন মেলে নতুন আলোর বান ;
মানব হিয়ার দ্বারে দ্বারে মিলন অভিযান।
তোমায় দিব অর্ঘ্য আনি, এমন সাধ্য নাইক জানি ;
ব্যর্থ প্রয়াস চরণ ছুঁয়ে হউক মূল্যবান।

২৫শে বৈশাখ

সত্যেন্দ্রনাথ জানা

মায়ের কোলে জন্ম নিল
আপন ভোলা বিশ্বশিশু
এই তো রবি, এই তো নিমাই
এই হজরত, এই তো যীশু !
ভিন্ন মায়ের ভিন্ন কোলে
একই মায়ের পুলক দোলে
বিশ্বমায়ের স্তন্য-সুধা
পান করে সব একই শিশু !

ধরিত্রী আজ ভারতমাতা
একই মায়ের ভিন্ন ধারা
বক্ষে ঝরে স্নেহের পীযূষ
আনন্দে তাই আত্মহারা ;
কক্ষে রবির পূর্ণ আলো
বৈশাখে আজ দীপ জ্বালালো
পুণ্যতোয়া ভারতভূমে
কর্‌লে উজল ফলপ্রসূ !

ধন্য

নিশিকান্ত

ধরণী আজি ধন্য হল তোমার চলা লভি' ;
তোমার চলা উদয়াচলে জাগালো নব রবি।
সরণী তব চরণপাতে
কিরণ মাখা কুসুম গাঁথে,
পবন তব পরশলীলা ভুবনে চলে জপি'।
ধরণী আজি ধন্য হল তোমার চলা লভি' ;
তোমার চলা উদয়াচলে জাগালো নব রবি।

তপন কোন্‌-তপনে পায় দিগঙ্গনে আজি,
চাঁদের বীণা, তারার বেণু ভূতলে ওঠে বাজি'।
তোমারি সুরে ইন্দ্রধনু
শোভিল তব মর্ত্য-তনু :
মানবতায় রঙিল হল অমরতার ছবি।
ধরণী আজি ধন্য হল তোমারি চলা লভি' ;
তোমার চলা উদয়াচলে জাগালো নব রবি।

নববিকাশ জাগিল বীণাপাণির শতদলে !
অখিল আজি অর্ঘ্য আনে তোমারি পদতলে।
সকলে আজি তোমারি গানে
মিলিল তব অমল প্রাণে !
কালের ভালে নব দীপন দিয়েছ তুমি কবি।
ধরণী আজি ধন্য হল তোমার চলা লভি' ;
তোমার চলা উদয়াচলে জাগালো নব রবি।

বিশ্বকবি

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকবি—বিশ্বকবি—
তুমি ভারতের বাণী মূরতি
তুমি ভারতের ধ্যানের ছবি !
ভুবন-ভোলানো তব গানে গানে
সুধারসধারা ঢেলে দিয়ে প্রাণে
মুগ্ধ ধরার মানবে দেখালে
বিশ্বপ্রেমের ছবি !
বিশ্বকবি।

নব নব রূপে প্রতিভা তোমার
করেছে বিশ্ব জয়।
জগৎ-সভায় ভারতেরে তুমি
করিলে গরিমাময় !
মধুর ভাষায় মোহন ছন্দে
রূপ-রস-ধ্বনি বরণে গন্ধে

স্বরূপের মাঝে ফুটাইলে তুমি
চির অরূপের ছবি !
বিশ্বকবি ।

দানবের বশে দেশে দেশে যবে
করে মহা হানাহানি,
হে তাপস, তুমি তুলে নিয়ে হাতে
ভারতীর বীণাখানি
শুনাইলে মহা মিলনের গান ;
আঁধারে দেখালে আলোর নিশান
তুমি ভারতের কবি-গুরুদেব
জগতের তুমি রবি ।
বিশ্বকবি ।

আনন্দময় হে
নির্মল সরকার

আনন্দঘন
নবশ্যামলিমা
নিত্য মধুর ছন্দ ।
সুর-বন্দিত
বিশ্ব-পূজিত
হে চির আনন্দ !
সুরের মাধুরী
সুরভি প্রসারী
দিগ্ দিগন্তে জেগেছে—

প্রশান্ত বায়ে
বনানীর ছায়ে
রবির কিরণ লেগেছে।
শান্তির বাণী বাজে দিকে দিকে
সত্য-প্রেমের গান
মুক্তির অভিযান।
মিটে গেছে তাই
বিশ্বের সব
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব।
হে চির আনন্দ॥

কবি-প্রণাম

সন্তোষকুমার দে

হে ভারতভানু, শতবরষের পারে,
জগতজনের বন্দনা বাজে সঙ্গীতে শতধারে।

হে অমর কবি, তোমার নয়ন-প্রসাদে জাগিছে জাতি,
নীরবে নিভৃতে বঞ্চিত চিতে জ্বেলেছ আশার বাতি।
দেখায়েছ পথ বিশ্বজনেরে এক নীড়ে দিয়ে ঠাঁই,
বিভেদ-বিরোধ, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই তো নাই॥

হে কবি, তোমার সৃষ্টির পথ বিচিত্র বহুধারা,
শত শতাব্দী পারেও জাগাবে মানুষের প্রাণে সাড়া।
তব সঙ্গীতে মাতিবে ধরণী যতদিন রবে গান,
বিরহে-মিলনে, জনমে-মরণে তুমি আছ দিনমান॥

হে কবি, বিশ্বমানবের আজি মহামিলনোৎসবে
এক আঙ্গিনায় তোমার পূজায় মিলিয়াছে আজি সবে।
জগৎ জুড়িয়া বন্দনা গান বাজে তাই বারে বারে ;
হে ভারতভানু, শতবরষের পারে,—
প্রণমি সবে তোমারে ॥*

তোমায় নিয়ে গর্ব করি

সতীন্দ্রনাথ লাহা

তোমায় নিয়ে গর্ব করি
আমরা সবাই বাঙালী।
ভক্তি কুসুম ঐ চরণেই
শ্রদ্ধা ভরে সব ঢালি ॥
গাইছি তোমার দেওয়া গাথা
প্রণাম জানাই নোয়াই মাথা,
হৃদ-কমলে আসন পাতা,
সাজাই অর্ঘ্য ও ডালি ॥

ছন্দে গানে গল্প গাথায়
অমর কবি যা দিলে,
সর্বকালের সবার হাতেই
প্রেমের রাখী বাঁধিলে।
যুগে যুগে তোমার গানই
প্রীতির স্বর্গ রচবে জানি,
আনবে জানি, সর্বকালে
সবার মনে মিতালী ॥

* গ্রামোফোন কোম্পানীর সৌজন্যে

কবি-প্রণাম

রণজিৎকুমার সেন

বিশ্বলোক-বন্দিত
সুরলোক-ছন্দিত
বাণীবীণা-নন্দিত
হে কবি প্রণাম।

তুমি রবি ভাস্বর
চির অবিনশ্বর
হে রাজ-রাজেশ্বর
তোমারে প্রণাম ॥

দিলে প্রেম-অঞ্জন
ওগো হৃদিরঞ্জন,
খুলে দিলে বন্ধন
স্বদেশবাসীর।

এলো নব বৈশাখ
তব নামে বাজে শাঁখ
শুনি ডাক শুনি ডাক
তোমার বাঁশীর ॥

আজি প্রাণ উতরোল,
জাগে কল-কল্লোল,
তুমি কবি প্রোজ্জ্বল,
তোমারে প্রণাম।

জয় জয় সুন্দর,
জয়তু মহাসাগর,
হে ভারত-ভাস্কর
তোমারে প্রণাম ॥

এ কোন্ কবি

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এ কোন্ কবি, যার লাগি এই
বিশ্বে শ্রাবণ-ধারা জাগে ?
বাজে বেণু নদীর পারে,
আকাশে শুকতারা জাগে !
নিখিল-রূপের ঝরনাধারায়
বৈশাখ আনন্দে হারায়,
চৈত্র-দিনের রিক্ততা ওই
অগ্নিবীণার সঙ্গ মাগে !

আলোয় হল আলো ধরা
এ কোন্ রবির পরশ পেয়ে ?
সন্ধ্যাবেলার মল্লিকা জুঁই
উঠলো ফুটে কুঞ্জ ছেয়ে !
রৌদ্রছায়া ধানের শীষে
সুর হয়ে যে গেল মিশে,
শিরীষ ডালে লাগলো নাচন
সেই পুরাতন অনুরাগে !

তোমার পায়ের চিহ্নগুলি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

তোমার পায়ের চিহ্নগুলি
আমার যাবার পথে
এখনো সে বিছিয়ে আছে
ধূসর আলোর স্রোতে।
সেই যে পথের পুণ্য-ধূলি
আমায় পরম রতনগুলি,
তারে আমি কুড়িয়ে রাখি
সকল দৈন্য হতে॥

দূরে উদাস বনের ছবি
আকাশ চিত্রপটে
শান্ত নদীর জলের বেদন
শূন্য নীরব তটে।
আকাশ-মাটি সবার কাছে
তোমার যে গান ছড়িয়ে আছে,
এই জীবনে সে গান বাজুক
আঁধারে আলোতে॥

তোমারে প্রণমি আজি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

তোমারে প্রণমি আজি
হে রবি ঠাকুর!
আজি এ বিশ্বমাঝে
তব প্রেম-গীতি বাজে

যে গান সকল বাধা
করিয়াছে দুর।

মানুষেরে ভালবেসে, সাধক কবি
এঁকেছ মানব-মনের অনেক ছবি।

শততম জন্মদিনে
তোমারি প্রেমের বীণে
বাজাই তোমারি গান
অমর যে সুর
তোমারে প্রণমি আজি
হে রবি ঠাকুর!

রবীন্দ্র প্রণাম
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কথাকলি সুর ছুঁয়ে ছন্দ জড়ায়
বিভাবতী রূপবতী মুখ তুলে চায়।
একটি চোখেই দেখি
গভীর ভাবনা সেকি
মানুষের শুভধ্যানে বিশ্বে হারায়।
ভারত-মানস দূত, পূবে পশ্চিমে
উদার হৃদয় খুলে দিলে নিঃসীমে ;
জাতির অমৃত গাঁথা
কথা আর সুরে মাখা,
মনের গোপন কথা পাপড়ি মেলায়।

পৃথিবী-পথিক

হেমলতা ঠাকুর

জন্মেছিলে পৃথিবীর আনন্দের কোলে,
জননী দুলায়ে ছিল আনন্দের দোলে
শিশু ছিলে যবে, কবে মাতৃকোল হতে
বাহির হইলে তুমি পৃথিবীর পথে
পশে নাই কানে কারো সে শুভ-সংবাদ,
পায় নাই কেহ তার আনন্দ-আস্বাদ
সেই ক্ষণেঃ শুধু এই পৃথিবীর প্রাণ
অচেতনে লভে ছিল তাহার সুঘ্রাণ।
বিশ্বের বিচিত্র রূপ ঐশ্বর্য সম্ভার
তুলিল তোমার চিত্তে আনন্দ-ঝংকার,
শুনাইল এ বিশ্বের সকলি চিন্ময়
পৃথিবীর ধূলিকণা সেও জ্যোতির্ময়।
অসীমে সীমায় মিল মৃত্যুতে অমৃতে
আনন্দ-বীণায় বাজে তোমার সংগীতে।
মরণ মরণই নয় শুধু আসা-যাওয়া
পৃথিবীর পথ শুধু সুরে সুরে হাওয়া
পৃথিবী-পথিক, তুমি পৃথিবীর কবি
গানে সুরে আঁকি গেলে পৃথিবীর ছবি
সত্যের আলোকে জ্বলে অন্তহীন কালে
চির সুন্দরের রূপ পৃথিবীর ভালে।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকালোক শৈলপারে অস্তমিত জ্যোতির মণ্ডল,—
অন্ধকারে অভিভূত বিশ্ব মানবের মর্ম্মস্থল।
নমো নমঃ গুরুদেব, আর দেখা হবে নাতো হায়!
আশার সলিতা শেষ, প্রদীপের বুক পুড়ে যায়।
যেথা গেছ সে মালঞ্চে ফুটায়েছ আলোর প্রভাতী,
অমর কবির লোকে মিলিয়াছে পরিচিত সাথী।
যাঁহাদের দিব্য স্বপ্নে অতীতের স্মৃতি উদ্‌ভাসিত,
স্বর্ণলঙ্কা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কীর্ত্তির মেখলা অলঙ্কৃত,
পেয়েছ তাঁদের সঙ্গ রহস্য-নেপথ্য-অন্তরালে,—
চিরন্তনী জয়ন্তীর অজিত তিলক শোভে ভালে।

এ পারে নিবিল চিতা, ভেদিয়া ধূমের আবরণ
উত্তরিলে পিতৃধামে, অভয় শান্তির নিকেতন।
উপলব্ধি করিয়াছ তরঙ্গেতে সমুদ্র-আত্মায়,
মানস-প্রয়াগে তব যুক্ত বেণী মুক্ত হয়ে যায়।
সত্য মহাকাশ-তুল্য, প্রলয়ে যা নিশ্চিহ্ন না হয়,
তুমি তারি তীর্থঙ্কর,—কবিতা সে তোমারি হৃদয়।

গৌরবের ধারা-ধ্বনি প্রদক্ষিণ করিছে ধরণী,
দিগ্বিজয়ী যশোমূর্ত্তি, রথশীর্ষে সূর্যকান্ত মণি।
উৎসব করিলে শুরু বাঙলার দখিন বাতাসে,
এই মাটি, এই জলে উচ্ছ্বসিত প্রাণের উল্লাসে।
চম্পকের পীত প্রভা, নীল ছায়া অপরাজিতার,
জবার সে রক্ত-রাগ প্রতিভাত কটাক্ষে তোমার।

বরণ করিল তোমা উদয়-সুন্দর ঋতুরাজ,—
ব্যথাতুর করি তারে হে দরদী ছেড়ে গেলে আজ।

ঝরে বিচ্ছেদের অশ্রু তরুলতা পল্লব মর্মরে,
সুখের আকুতি-ভরা মানুষের অতৃপ্ত অন্তরে।
কবিদের কবি তুমি, পেলে অনন্তের আলিঙ্গন,
সুপ্রসন্ন অন্তর্যামী, ধন্য গীতাঞ্জলি নিবেদন।

কল্যাণ সঙ্কল্প তব, যোগ-দৃষ্টি, অক্ষয় পৌরুষ,
আদর্শ তপস্যা-ফলে মোরা সবে নূতন মানুষ।
ভাষণে ভূষণ দিলে, গানেরে দিয়াছ তুমি প্রাণ,
সুরের পিঞ্জর হতে রসের ঐশ্বর্য পায় ত্রাণ।
বিতরে অমৃত-বীজ অনবদ্য তব অবদান,
দ্বিতীয় মহাভারত বিরচিলে মহর্ষি-সন্তান।
দর্শন-পরিধি তব বৃহত্তম বৃত্তে মিশে যায় ;
ভাস্বর স্বাক্ষর তব নবীন যুগের সংহিতায়।

অসীমের মানচিত্র আঁকিয়াছ সীমারেখাহীন,—
জাগিয়াছ যে দিবায়, যে উষায় তিমির বিলীন।
দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিলে মহীয়সী বাঙলার বাণী,
সার্বভৌম বিদ্যাপীঠে পাতিয়াছ পদ্মাসনখানি।
তব বাক্-স্বাধীনতা, দেবদত্ত শঙ্খের নিনাদ,
উদাত্ত-বিরাট কণ্ঠ বিনাশে জাতির অবসাদ।

ডাক দিলে নিরাশ্বাস, পীড়িত, লাঞ্ছিত জনতায়,
উচ্চারি' স্বস্তি-বাচন আশিসিলে মৈত্রী-করুণায়।
উদ্বোধিয়া গণশক্তি ঐক্য-রাখী করিলে বন্ধন,
পুণ্য মন্ত্রে দীক্ষা দিলে। গঙ্গাজলে করিনু তর্পণ।

যেখানে বিরাজ তুমি অন্তরের শ্রদ্ধা সেথা যায়,
অচিন্ত্য অ-দ্বয় যিনি জানিয়াছ সেই অজানায়।'
সর্ব-রূপ, সর্ব-রস, শব্দ যাঁর না পায় সন্ধান,
চরিতার্থ আজি তুমি, লভিয়াছ সেই আত্মস্থান।

রবীন্দ্র-স্মৃতি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

স্মৃতিরে রক্ষিব কোথা ? একমাত্র অন্তরের হিমাদ্রিশিখরে
আছে তার গুপ্ত গুহা। যেথা ধ্যানাসনে বসি নিভৃতে একাকী
দুয়ারে অর্গল রুধি' ঘরে ঘরে মোরা আজ যদি বসে থাকি,
শুচিশুভ্র মেঘমালা ঘনীভূত হবে সেথা মোদের অন্তরে,
অমল তুষারপুঞ্জে বিরচিবে হে সুন্দর তব মুখচ্ছবি।
বাংলার এ শ্মশানে শিবমূর্তি সম যেন চক্ষে আজি জাগে।
শ্বেতশ্মশ্রু-জটাধারী চন্দ্রভাল সে আনন, বাম পার্শ্ব ভাগে
কাব্যলক্ষ্মী, শিবের শিবানী সম অর্ধাত্মিকা যিনি তব কবি !

বাহিরে হারায়ে মোরা অন্তরে তোমারে খুঁজি, হে অন্তরতম।
স্বপ্ন অনুভূতি তব, ভারতের চিরাদর্শ শান্ত শিব অদ্বৈতের ধ্যান,
তোমার জীবন-বীণা নানা মীড়ে মূর্ছনায় ছন্দে অনুপম
রটিয়াছে গানে গানে, অতীতের ঋষিমন্ত্র তোমার ব্যাখ্যান
লভিয়া হয়েছে স্বচ্ছ অর্বাচীন অনভিজ্ঞ মোদের নয়নে।
হোক তব স্মৃতিপূজা সে মন্ত্রের, মননে ও নিদিধ্যাসনে।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মেঘ চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা রুদ্ধমান আলোয়
শহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিবল,
রাত কাটল,
পূর্ণিমা ছাড়ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এমনি দিনেই,
এমনি শ্রাবণঘন গহন মোহে,—
কাননভূমি যখন কূজনহীন,
সকল ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মত নীরবে পথ চলে।
শহরে তা অশোভন,
শহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধা পথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হয়ে
পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূর হতে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!

সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ !
মনে হল—
কি বিচিত্র শোভা তোমার—
কি বিচিত্র সাজ !
জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া যোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হয়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু !
হায় রে ! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি রহি গরজে !
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা ;
তারই বুক দ্বিধা করে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট পার হয়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু !
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ !
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু !
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস

বুকের পাটায় ঘষে ঘষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস করে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হল তোমার মাল্য !
করযোড়ে, নতশিরে, প্রণাম করে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায় !
মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সদ্যছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতই ভেসে
শোকের বারদরিয়ায়,
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিই নি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না।
আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোন গো বন্ধু মোর !
কিন্তু তুমি তখন,
আমার কথার বাইরে চলে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে !

আর সাথে সাথে
রিক্‌শাওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ !

তর্পণ

মোহিতলাল মজুমদার

মরিতে চাহিনা আমি এই চিরসুন্দর ভুবনে—
প্রাণের কামনা সেই নিবেদিলে কবে না সে জানি !
তারপর ফুরাল না সেই গান সারাটি জীবনে,
মৃত্যুও মধুর হেসে বারবার গেল হার মানি।
সেই এক মন্ত্রে তুমি জীয়াইলে বাঙলার বাণী—
ভুবন সুন্দর, তাই সুদুর্লভ মানব-জীবন ;
আকাশে তারায়-ভরা নিশীথের নীল ফুলবন,
তারো চেয়ে ভাল লাগে পৃথিবীর পান্থশালাখানি !

ভুলিতে পার নি তবু, একদিন আসিবে মরণ ;
যেতে নাহি দিবে ধরা—তবু তার বাহুপাশ খুলি
বাহিরিতে হবে দূরদীর্ঘ পথে ; কাঁপিবে চরণ,
নয়নে নামিবে ধীরে দিকহারা দিনান্ত গোধূলি।
সে দিনের কথা ভাবি বারবার বীণা লয়ে তুলি
রচিলে রাগিণী জিনি জ্যোৎস্নালোকে পিক-কুহরণ,
বিরহেরি ব্যথা হতে মিলনের মধু আহরণ
করিলে যে সুরে সুরে—তৃণ হতে তারারে আকুলি।

ফাগুন করিল হাহা সেই সুরে ফুলেদের বনে
করুণ কপোত-কণ্ঠে নিদাঘ যে গাহে মূলতান !
বহুযুগ পার হতে আষাঢ় ঘনায়ে আসে মনে,
মালবিকা, রেবা-নদী—মনে পড়ে কবেকার গান !
শরতে শেফালি-মূলে সেই সুরে বিলাইয়া প্রাণ
মালা গাঁথা ভুলে গিয়ে বসে থাকা কোন দেয়াসিনী !
সোনার-আঁচল-খসা, তন্দ্রালসা, সন্ধ্যা মায়াবিনী
না জ্বালাতে মণি-দীপ—হেমন্তের দিবা অবসান !

'মরিতে চাহি না' বলি, ভুবনের বাসর-ভবনে
মরণেরে পরাইলে জীবনের স্বয়ম্বর-মালা !
শ্রাবণের মেঘ হয়ে নামিল সে তমালের বনে,
নীলকান্ত-রূপে তার নিশীথিনী হল যে উজালা !
উষার অঞ্জলি হতে সন্ধ্যা ভরে আবীরের থালা,
একই রঙে রাঙা হয় অস্ত আর উদয়-সরণি !
গাহিলে কি সুর তুমি মরণের পরাণ-হরণী—
ভরিল সে নিজ হাতে জীবনের রসের পেয়ালা !

এতদিন পরে আজ যেতে হল তেয়াগি তাহারে—
যার শুধু দরশনে অঙ্গে জাগে দিব্য-পরশন !
যাহার কুন্তল-গন্ধ বন্ধ করি আঁখি অন্ধকারে
অতুল পুলকে ভরি তুলেছিল স্বপ্ন-জাগরণ !
সারাটি জীবন ধরি যে কাননে করি বিচরণ
চয়ন করিলে কত নামহারা রূপের মঞ্জরী,
মাঠে বাটে আঙিনায় কুড়াইলে কত সাধ করি
মাটির সে মিঠা-মূল—অমৃতের ক্ষুধা-নিবারণ

প্রাণের সে রাজপাটে একছত্র গানের শাসন
সম্বরি চলিলে আজ কোন মহানীরবতা-কূলে !
কোন দূর জ্যোতির্লোকে—জন্মমৃত্যু-তিমির-নাশন—
লগ্ন হবে ভৃঙ্গ সম পূর্ণস্ফুট পূর্ণিমা-মুকুলে !
মধু তার পান করি জড়াবে কি মরমের মূলে
সুচির গানের দাহ ? সেথা কোন ভুবন সুন্দর
জাগাবে না মৃত্যুভয় ? অনিমেষ-আঁখি, অকাতর,
নেহারিবে কোন্ বিভা আলোকের যবনিকা তুলি !

তবু যে হয়নি ব্যর্থ সেই তব কামনা প্রাণের—
চেয়েছিলে তুমি, কবি, 'মানবের মাঝে বাঁচিবারে' ;
এতদিন বুঝি নাই, আজ বুঝি মর্ম সে গানের,
শত-শিখা হয়ে সেই প্রাণ জ্বলে শত দীপাধারে !
গান হয়ে গুঞ্জরিছে অশ্রু আর হাসির মাঝারে,
মুকুল মঞ্জরি ওঠে অলক্ষিতে শতেক শাখায়,
শতেক নয়নে সে যে স্বপনের কুহক মাখায়,
বাণী হয়ে ফিরেছে সে হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে !

তোমার কীর্তির চেয়ে বলিব না, তুমি যে মহৎ—
বলিব না, সৃষ্টি হতে স্রষ্টা আছে উর্ধ্বে বহু দূরে।
জানি, সে কায়ার ছায়া মিলাইয়া যাবে স্বপ্নবৎ,
অজর অমর যাহা—বেঁচে রবে এই মৃত্যুপুরে।
সেই তব মূর্তিখানি, ছায়া যার আলোক-মুকুরে
পড়িলে সরে না কভু, যত দূরে দেহ যাক সরি—
মহান তাহার চেয়ে আছে কিবা ? জন্ম জন্ম ধরি
কে লভিবে হেন প্রাণ, হেন রূপ, স্বর্গমর্ত্য ঘুরে ?

ফুটে আছে সেই প্রাণ—বিকশিত বিশ্ব-চেতনার
অরবিন্দ সম—তব কবিতার অকূল সায়রে !
নাহি তার নাম-ধাম, সে তো নহে কেবলি তোমার—
তোমা চেয়ে বড় যেই সেই সেথা নিয়ত বিহরে।
ছিল যাহা বিন্দু তাই রূপ নিল বাণীর সাগরে !
তোমার ও কীর্তি মাঝে তুমি শুধু হওনি অমর
হয়ে আছ অন্তহীন রূপ আর ভাবের নির্ঝর,—
অমৃতের হাসি সে যে চিরজীবী মৃত্যুর অধরে।

রবীন্দ্র-স্মরণে

অসিতকুমার হালদার

বঙ্গ বীণার স্তব্ধ বীণা
অনন্তে আজ হল লীন
ঝঙ্কারে যার বিশ্ব মুখর
রুদ্ধ মধুর আলোক হীন !
খস্‌ল দেখি হিম শিখরের
শীর্ষ আজি দৈবে কোন্ !
রবীন্দ্র নাই ইন্দ্রসভায়
গেছেন তোরা শোন রে শোন্ !
ফুল রয়েচে, ভ্রমর যে নাই—
ভরবে মধু মৌচাকে ;
রঙ রয়েচে, পটুয়া নাই
মোহন ছবি কে আঁকে ?
মেঘ রয়েচে, আছে ভুবন
গাইবে কে হায় তাদের গান ;

দখিন হাওয়ার আলো ছায়ার
রূপ লিখে কে ভরবে প্রাণ ?

রবির আলোয় বসুন্ধরা
যে সুর চলে তার সুরে
সুর মিলিয়ে দেখাল যে
রসগন্ধে দেয় পুরে।

সকল রসের আবাসখানি
রাখলে ধরে কাব্যে তাই—
এখন দেখি শেষ পরিবেশ
পরিবেশক হেথায় নাই।

দিনেক আসা দিনেক যাওয়া
তার তরে তার দুখ কোথা ?
জাতিস্মরের জাত সে কবি
জানতো সবই সে-ও তা।

দুঃখ সুখের হার পরালে
গানের সুরের মালার পর
দিন দুয়ের আবাস ছাড়ি
গেল যেথায় যাবার ঘর !

অমর কবি মৃত্যুজয়ী
ভূমার কিরীট তার মাথে,
আজকে কে হায় বিদায় বেলায়
পরায় রাখী তার হাতে ?

এক রবি সে দিল আলো
বাণীর কুঞ্জে জগৎময়
অস্তে গেল রশ্মি রেখায়
মানব হৃদয় করলে জয় !

মহাপ্রাণ সে প্রাণের পারে
আছে যেথায় প্রাণ ভরি
গেছে সেথায় অরূপ লোকে
অপরূপ কি রূপ ধরি !
শোক মোরা কি করব বল
দিলাম রেখে শেষ প্রণাম !
দেব্‌তা তিনি গেছেন ফিরে
আপন পুন অমরধাম।

রবীন্দ্রনাথ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যে রবি উদিয়াছিল উদয়-অচলে বাঙ্গালার
অশীতি বৎসর পূর্বে, পূর্বের আকাশে লিখি তার
জ্যোতির্ময়ী আগমনী আলোকের অলোক আখরে,
দেশে দেশে বরনারী পড়িল যা কত সুরে স্বরে,
কত চিত্তে দিল দোলা অমৃত অভয় বারতায়
পরিপূর্ণ আনন্দের ছন্দে গন্ধে অভি বন্দনায়—
সে রবি ডুবেছে আজ অপর-পারের মোহানায়
দিগন্ত চুম্বিত নীল অম্বুবিম্ব কাদম্ব মালায়।

মহীর এ মহাকাশে মহীয়ান প্রদীপ্ত ভাস্কর
এক তুমি বহুরূপে সহস্রাংশু জ্যোতির আকর ;
ধরার আঙন কোণে জ্ঞানের তুলসী-বেদি-মূলে
একটি দেউটি ছিলে এই মর্ত্য ভাঙনের কূলে।
মানুষের কবি তুমি, মানুষের প্রতিনিধি হয়ে
মানুষে চিনিয়াছিলে মানুষের সত্য পরিচয়ে।

ছোট বড় দুঃখ সুখ ক্ষতি ক্ষোভ ব্যথা তার
লজ্জা ও আকাঙ্ক্ষা মৌন, ব্যক্ত ও অব্যক্ত গুরুভার,
বেদনার অন্তরালে অন্তরের অভিব্যক্তি ভীত,
তাহাদের ভালবাসা আশা ভাষা কল্পনা শঙ্কিত,
অজানা ছিল না তব ! বঞ্চিত আত্মার হাহাকার
কুণ্ঠিত কণ্ঠের বাণী, মুক্তি পেত বাণীতে তোমার।

মাঝে মাঝে তুমি কবি প্রলয়ের রুদ্রের আবেগে
বিদ্যুৎ কম্পিত ছন্দে দীপকেতে উঠিয়াছ জেগে
অগ্নিগিরি সম। কভু নির্যাতিত পীড়িতের সাথে
বন্দীর বন্ধন দুঃখে নিন্দিয়াছ ভাগ্যে করাঘাতে।
অন্যায়ে ও অপমানে অত্যাচারে অবিচারে তব
জ্বলিয়াছে রোষবহ্নি নিত্য নিত্য তেজে নব নব।

বাণীর প্রমূর্ত বীণা মর্ত্যধামে এসেছিলে কবি
অ-সুরে ও অ-সুন্দরে সুরে সুরে ভরি দেছ সবি।
অতীব ঐশ্বর্যভারে ন্যুব্জ হয়ে কোথাও না পড়ে
নবীন ভূষায় তারে সাজায়েছ বর্তমান তরে।
বাঁধিয়াছ জলধির চল-উর্মি মালিকার মত
অকূল ও কূলে, আর নিকটে ও দূরে, গতায়াত।

আসিয়া মোদের আগে দিয়াছিলে রাখিয়া যেমন
ভারে ভারে থরে থরে বিবিধ ও বহু রত্নধন
তেমন আজিও যারা আসেনিক, দিগন্ত সীমায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ রেখাসম রজত লীলায়,
সেই সব ভাগ্যবান অনাগত ভবিষ্যৎ লাগি
দেহহীন বাণী মূর্তি রূপে তুমি রবে চির জাগি।

দান শুভ্র শ্রাবণের ধারাযন্ত্রে আরও বাজিবে
সঘন সজল গীতি ; আমাদের অন্তরে রাজিবে
বর্ষারম্ভে বর্ষাঅন্তে—বৈশাখে শ্রাবণে—অনুক্ষণ
বর্ষণ-মুখর এই ঘনকৃষ্ণ বাইশে শ্রাবণ !

কবি-প্রয়াণ

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমন শ্রাবণ, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল ভুবন,
এত অনুরাগে ভরা মানুষের মন,
রৌদ্রে তবু ঝরে কেন বৈরাগ্যের সুর ?
প্রকৃতি করুণাময়ী, নিয়তি নিষ্ঠুর।

নিস্পন্দ অতল সিন্ধু, নিস্তব্ধ বাতাস,
নিঃশব্দ আকাশ, শুধু মৃদু দীর্ঘশ্বাস
ধীরা ধরণীর—যেন অতি নিঃসহায়
মূর্চ্ছিত মুহূর্ত সাথে মিলাইয়া যায়।
যেথা শান্ত জীবনের অশ্রান্ত মর্মর,
অসীম সাগর আর অনন্ত অম্বর
রচিয়াছে লীয়মান দিগন্তের রেখা
পার হয়ে তাহা—আসে যেন, যায় দেখা,
অচেনা দেশের কোন্ সোনার তরণী।
বিমূঢ় চাহিয়া থাকে বিস্মিত ধরণী।
সমাপ্ত কি কাজ, কবি, সমাপ্ত কি গান ?
কে ডাকে ইঙ্গিতে দূরে ? কাহার আহ্বান ?

* * *

জাগো রবি ! নিবে গেল পূর্ণিমার শশী ।
জাগো রবি, অস্তাচলবাসিনী উর্বশী
অস্তে গেছে—ফিরিবে না আর । জাগো রবি !
অন্ধকারে বিলুপ্ত পৃথিবী । জাগো রবি !
খোল আঁখি, কথা কও, হে আমার কবি ।
মেল আঁখি, মানসে যে মুদিত কমল ।
মেল আঁখি, চেয়ে দেখ কত যে দুর্বল
মোরা, আজ কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়,
বিক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁদে দুঃসহ ব্যথায় ।
জাগো, জাগো, জাগো রবি, জীবনের জয়
গাও পুনর্বার । দাও বল, হে নির্ভয়,
জাগো—নব-প্রেরণায় জাগাও জাতিরে ।
জাগো রবি ! এস ফিরে এ শূন্য মন্দিরে ।

গুরুদেব

প্রতিমা দেবী

যিনি ছিলেন দু-জনের মাঝে
ইন্দ্রধনুর সেতু
যাঁর রঙের তুলি বুলিয়েছিলেন চোখে
সেই আলোতে দেখেছি বিশ্বের রূপ ।
আজ সেতু ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন
মাঝের ফাঁকা আকাশ পূর্ণ হল
অনুভূতির স্তব্ধতায় ।
যে নীড়ে বেঁধেছিল প্রকৃতি
কবি-চিত্তের তার

সেই জ্ঞানের প্রাচুর্য ধ্যানের ইন্দ্রজাল
দিনের গোধূলিতে মিশিয়ে গেছে।
তিনি নিভে গেছেন, দৃষ্টির সীমানায়
নির্বাপিত জ্যোতি তাঁর উদ্দীপ্ত হল
নিখিলের আকাশ-প্রদীপে।
অন্তিম দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেল
বাহিরের জনসমুদ্রের বুকের ভিতর
মানব-হৃদয়ে রহস্যগুহায়, বাণী হল
তাঁর বন্দী—
যে শ্রাবণ-পূর্ণিমা কতবার তাঁর
প্রাণকে উদ্বেলিত করেছে
সেই পূর্ণিমা তিথিতে ভাসল
পরপারের খেয়া
বদায়ের সারি গানে।
বর্ষার দিন উচ্ছলিন
ছিন্ন মেঘের পালে পালে,
ভূমার অনুরাগ দীপ্ত
অস্তাচলের আবেগ
রইল থমকে।
স্নেহের অজস্রতায়
সমাপ্তির শেষ কথা
চিত্তে দিয়ে গেলে ভবে
সেই নীরব কণ্ঠের সঙ্কেত প্রেরণায়
পূর্ণ থাক আমাদের
নিত্য নিবেদনের থালা।

রবি-প্রয়াণ ক্ষণে

শান্তি পাল

হে রবি আজিকে দাঁড়াও ক্ষণেক
অস্ত-অচলোপরি,
আমি বনফুল দূর হতে তোমা
বারেক প্রণাম করি।
এখনো হয়নি দিবা অবসান,
এখনো গোধূলি হয়নিক' ম্লান,
এখনো বিহগ তন্দ্রার গান
তোলেনি কানন ভরি'
বসুধা বিকল আঁখি ছলছল
বিদায়ের কথা স্মরি!

দূর দিগন্তে হাসে দিগ্বধূ
তোমার মিলন লাগি,
দিনের চিতার লালিমা আড়ালে
রয়েছে প্রহর জাগি।
আকাশে হাসিছে দেবতার দল,
হেথায় সায়রে শুকায় কমল;
বিদায় ব্যথায় মুরছায় যত—
আলোকের অনুরাগী।
তিমির নিশার তপস্যা তরে
তোমার করুণা মাগি!

রবীন্দ্রনাথ

কৃষ্ণদয়াল বসু

সেদিন স্বপনে দেখিনু গোপনে কবিরে গভীর রাতে
শ্রাবণ-পূর্ণিমাতে,
চিরদিনকার বীণাখানি তাঁর হাতে।
শুধালেম—"কবিগুরু,
অজানার পথে যাত্রা তোমার এবার হ'ল কি শুরু ?"
কহিলেন কবি—নিখিলের কানে কানে
বাজিল সে বাণী বীণার করুণ তানে,
ভেসে গেল সুর সুদূর পথের শেষে
দিগন্ত যেথা মেশে অনন্তে এসে—
"আমি কবি, আমি র'ব না, তবুও জেনো চিরদিন র'ব।
আমি রবি, চির-গগনে গগনে আমি-যে নিত্য নব।"

কাঁদিয়া কহিনু—"আকাশে আকাশে আঁকা সে আলোর ছবি,
জানি তুমি সেই রবি,
চিরদিনকার তুমি বীণকার, কবি !
তবু মন মানে না যে,
তোমার বিরহ সে-যে দুঃসহ অহরহ বুকে বাজে।"
কহিলেন কবি—"আবার আসিব ফিরে
এই ধরণীর অশ্রুনদীর তীরে।
ম্লান মূক মুখে ফুটায়ে তুলিতে ভাষা,
ব্যথাতুর বুকে জাগায়ে তুলিতে আশা,
আমি কবি, আমি যুগে যুগে হেথা নূতন জন্ম ল'ব।
আমি রবি, নিতি উদয়ে বিলয়ে নিত্য নবীন র'ব ॥

শিশুর স্বপনে, কিশোরের মনে, চির-তরুণের বুকে,
জননীর হাসিমুখে
চির-দিনযামী জেগে র'ব আমি সুখে।
নীরবে আসিব নেমে
বিরহে-মিলনে হাসি-ক্রন্দনে স্নেহে-করুণায় প্রেমে।
বন্ধুর পথে চলে যাব কোন্ দূরে,
ফিরে দেখা হলে চিনিবে কি বন্ধুরে ?
মনে ছিল আশা, ভালোবাসা পাই আরো।
ভুলে যেয়ো, যদি আমারে ভুলিতে পারো।
আমি কবি, আমি মরিতে চাহিনি এ কাহিনী কারে ক'ব।
আমি রবি, নিতি নূতন প্রভাতে উজলিব নব নভ ॥

আশা তাই মনে আবার স্বপনে কবিরে দেখিবে রাতে,
শারদ-পূর্ণিমাতে,
কভু মধুমাসে কুসুম-সুবাসে প্রাতে।
নিখিল-বীণার তানে
শুনিবে কবির যে-বাণী গভীর বেজে ওঠে গানে গানে।
প্রেমের আসনে বরণ করেছ যারে
মরণ কি তারে হরণ করিতে পারে ;
চির-স্মরণের অশ্রু-সাগর পারে
সে-যে তরী বেয়ে আসিবেই বারে বারে।
"আমি সেই কবি, আঁধারে আলোকে চিরদিন সাথে র'ব।
আমি সেই রবি, নব নব লোকে নিত্য পুনর্ণব ॥"

অস্তরাগ

সুধীরকুমার চৌধুরী

জানাশোনা ছিল দুটি পৃথিবীর সাথে,
দুটি পৃথিবীর অজস্র-রসে হৃদয়-পাত্র ভরা,
একটি তাহার গড়া বিধাতার হাতে,
আরেকটি ছিল তোমার সৃষ্টি করা।

আজ তুমি নাই, তোমার সৃষ্টি সেই পৃথিবীতে আছি,
তাহারই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি।
বিধাতারও গড়া ধরার বাতাসে বাঁচি নিঃশ্বাস নিয়ে,
রয়েছেন তিনি, মনে মনে জানি তাই ;
তোমার মতন তাঁহারও মৃত্যু হয় যদি, তখনি এ
পৃথিবী সে-কথা কবে না ত কারে ; শুধাব সে কার ঠাঁই,
কেমনে তা জানা যাবে ?
তুমি নাই, তব সৃষ্টি সে-কথা বলে না ত কোনোভাবে !

তোমার সৃষ্টি পৃথিবীর পরে জ্বলে স্বর্গের আলো,
তোমার নয়ন বারে বারে যে ভুলালো,
বিধাতার গড়া রয়েছে সে পৃথিবীও,
নাই কি গো সেই পরম-দেবতা, তোমার পরাণ-প্রিয়,
যাঁর বিভূতির শুধু এককণা লভি'
দুদিনের লাগি' আমাদের মাঝে এসেছিলে তুমি কবি ?

তোমারে হারায়ে নিজেদের লাগি' অনেক করেছি শোক,
আজি সে ক্ষান্ত হোক।
কে জানে হয়ত দেবতা আছেন বেঁচে,
কোথা তাঁর কোন্ নূতন পৃথিবী মন তব ভুলায়েছে !

এবারে তোমার লাগি'
শোক করি এই বিনিদ্র রাতে একটি প্রহর জাগি'।
পৃথিবীতে এসে মিটিল না কোন আশা,
জনম অবধি দিয়ে দিয়ে তবু ফুরাল না ভালবাসা,
কি বলা হ'ল না, পাও নাই অবসর,
কোন্ প্রিয় কাজ শেষ নাহি হতে এল মৃত্যুর চর।

কাজ সেরে ফিরে গেছে মৃত্যুর দূত,
এত প্রিয় তব পৃথিবীতে তুমি নেই, কি যে অদ্ভুত!
তবু এও জানি, এমন ত দিন রয়েছে সমুখে কত,
তুমি ছিলে এই পৃথিবীতে মনে হবে স্বপ্নের মত।
মানুষের এই জগতে তুমিও ছিলে একদিন কবে,
অদ্ভুত মনে হবে।
হে গুরু, হে প্রিয় বন্ধু, একদা ছিলে আমাদের মাঝে,
বুঝিব কি কভু সেটি কতবড় অঘটন-ঘটনা যে!

কতটুকু তব দেখেছি বা, আর জেনেছি বা কতখানি,
কতটুকু শোনা গেল বুকে বয়ে এনেছিলে যেই বাণী,
তবু তারই মাঝে এ-কথা নিয়েছি শিখে,
মানুষের বলে জানি যেই-ধরণীকে,
কতখানি সে যে দেবতার অধিকারে!
সাথে করে এনে আমাদের মাঝে রেখে গেলে তুমি তাঁরে!
আজ তুমি পরলোকে,
অন্ধ নয়ন অশ্রু-আকুল শোকে;
তবু মনে জানি, যেই স্বর্গেরে দেবতার বলে ভাবি,
তুমি সেথা আছ তাই, তারপরে মানুষেরও আছে দাবি।

তুমি আছ বলে স্বর্গ সে বরণীয়,
তুমি ছিলে তাই ধন্য এ ধরণীও,
তুমি গেছ বলে মৃত্যুর পথ ধরি
জানি সে-পথেও গানের আবেগে আলো কাঁপে থরথরি।

২২শে শ্রাবণ স্মরণে
পরিমল গোস্বামী

তুমি যদি রইতে বেঁচে আমাদের এই কালে
বলতে পারি কি যে এখন ঘটত তোমার ভালে।
দেখতে তুমি অবশেষে তোমার বঙ্গজননী সে
লাঞ্ছিত হয় অবাঞ্ছিত নরপশুর হাতে।
মানুষ মরে হাজার হাজার খাদ্য হরে কালোবাজার
জীবনতরী আর বহে না মন্দাক্রান্তা ছাঁদে।
দেখতে হ'ত দাঙ্গাবাজি সকল ভারত জুড়ে,
অন্তরীক্ষ আঁধার করে শকুন বেড়ায় উড়ে।

তুমি যদি থাকতে বেঁচে আমাদের এই কালে
চিন্তামূঢ় রইতে চেয়ে হস্ত রাখি গালে।
ধ্বনি শুনে 'লড়কে লেঙ্গে' মিলন স্বপ্ন যেত ভেঙ্গে
দেখতে হ'ত দেশের মাটি রক্তস্রোতে ডোবে।
র‍্যাথবোনেরা বিদায় বেলায় দিল ঠেলে পাঁকের তলায়
তোমার স্বদেশ, যেমন তুমি বলেছিলে ক্ষোভে।
সেদিন হ'তে খণ্ডিত দেশ, শান্তি উধাও, কবি,
তুমি যেমন এঁকেছিলে ফুটল না সে ছবি।

তোমায় যদি বাঁচতে হ'ত আমাদের এই কালে
দেখতে হ'ত গান্ধিহত্যা আটচল্লিশ সালে।
দেখতে, সকল বিশ্ব জুড়ে শান্তিবাণী হাওয়ায় উড়ে
ইউ-এন-ওর নূতন বাণী শুনতে শ্রবণ পাতি।
মানব নীতির কবর 'পরে কূটনীতির ধ্বজা ওড়ে
রাতকে যাহা দিবস করে দিবস করে রাতি।
হিংস্রবাণী ব্যঙ্গ করে শান্তিবাণীটিরে
চণ্ডধর্ম আসর জমায় বদ্ধমুষ্টি ঘিরে।

তোমায় যদি চলতে হ'ত আমাদের এই কালে,
পাগল হ'য়ে ঘুরতে বোধ হয় খাওয়া পরার তালে।
কাব্যলেখা যেত চুলোয় একতারাটি লুটতো ধুলোয়
নতুন গানে যোগ হত না একটি নতুন আখর।
মোটের উপর দিনে রাতে ছটাক চালের ভাতের সাথে
হজম করতে হ'ত তোমায় অর্ধ ছটাক কাঁকর।

তাই তো তোমায় স্মরণ করে গর্বে বেড়াই নেচে
আমরা মরি নাই কো ক্ষতি—তুমি গেছ বেঁচে।
তোমার চোখে দেখা জগৎ আকাশ বাতাস প্রান্তর পথ,
কল্পনাতে আজও আমরা দেখি তাহার ছবি।
কিন্তু মোদের কালের গ্লানি এই যে ইতর হানাহানি
তোমায় দেখতে হয় না, তোমার ভাগ্য, মহাকবি।
উঠছে গরল বর্তমানের সকল সাগর সেচে
আমরা তাতে তলিয়ে যাব, তুমি রইবে বেঁচে।

রবীন্দ্রনাথ

কলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

এসেছে গগন ঘিরে স্তরে স্তরে শ্রাবণের কৃষ্ণ জলধর,
সজল-সমীর-স্নিগ্ধ কদম্বের অঙ্গে অঙ্গে জাগে শিহরণ,
গুরু গুরু গুরু গুরু প্রকম্পিয়া শূন্য ব্যোম ধ্বনিছে ডম্বরু,
ঝিল্লিরবে কেকাছন্দে কন্টকিতা কেতকীর খসিছে গুণ্ঠন,
উদ্ভাসিয়া কৃষ্ণমেঘ বিদ্যুতের মুহুর্মুহু প্রদীপ্ত প্রকাশ ;
কোথা বরষার কবি ? কোথা তুমি, কোথা আজ, কোন্ অধরায়
উত্তরিলে অকস্মাৎ তেয়াগিয়া প্রিয়তমা মৃন্ময়ী ধরারে ?

আজও মনোরমা সে যে, নিত্য নব সৌন্দর্যের মাধুরী ভাণ্ডার
আজও তার অফুরন্ত, আজও তার অঙ্গে অঙ্গে ওঠে ঝলসিয়া
নব-দ্যুতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দিত কবি-চিত্ত চরিতার্থ করি ;
আছে সেই রাঙা-মাটি পথ, বাঁশী বাজে বেণুবন ছায়ে,
বকুল মল্লিকা চাঁপা কদম্ব করবী ফুটে আছে থরে থরে,
পলাতকা স্বপ্ন-সখী দেখা দেয় আজও ওই দামিনী-ঝলকে,
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হিম-শীত-বসন্ত-শরতে, রৌদ্রে, মেঘে, অন্ধকারে,
সন্ধ্যা-উষা-জ্যোৎস্নালোকে, কান্তারে প্রান্তরে, গৃহকোণে
ধরণী মোহিনী আজও, তুমি তারে ছেড়ে, মাটির দুলাল কবি,
কোথা গেলে, কেন গেলে, গেলে কোন অমৃতের নব প্রত্যাশায় ?
সে কি স্বর্গ দেব-লোক ? দেব-লোকে আছে স্থান মানব-কবির ?
লক্ষ কোটি নরনারী-হৃদয়-রাজ্যের রাজ-রাজ্যেশ্বর তুমি,
ধরণীর মৃত্তিকায় অভ্রভেদী সিংহাসন তব জ্যোতির্ময়,
আকাশের সূর্য-চন্দ্র সন্ধ্যা-উষা ইন্দ্রধনু জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
ছয় ঋতু নৃত্য করে বিচিত্র ভঙ্গীতে তব চন্দ্রাতপতলে,
রূপসী উর্বশী আসে নন্দনবাসিনী কাব্যকুঞ্জ-দেহলীতে

সিন্ধু-স্নান সমাপন করি ; শুচিস্মিতা বীণাপাণি পদ্মাসনা
সুর দেন তব গীতে স্বর্ণ-বীণা তন্ত্রে তন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিয়া
মর্ত্যের কবির কণ্ঠে জাগাইয়া অনবদ্য অমর্ত্য-মূর্ছনা,
অনন্ত অসীম আসে বন্ধন-লোলুপ তোমার সীমার মাঝে ;
তুমি যাবে দেবলোকে কিসের আশায় ? তুমি কবি আমাদের
লাঞ্ছিতের পীড়িতের দুর্গতের অন্তরের প্রিয় কবি তুমি,
কাঙালিনী মেয়ে, সাঁওতাল ছেলে, পুঁটুরাণী, ভৃত্য পুরাতন,
অবোধ শিশুর দল, সরমশঙ্কিতা বধু, মূঢ় দেশবাসী,
ইহাদের ফেলে রেখে কবি, যাবে তুমি কোন্ স্বর্গলোকে ?
যেতে পার ? সুনিবিড় এ বন্ধন ছিন্ন করা এত কি সহজ ?
বন্ধন-বিলাসী তুমি, 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়'
চেয়েছিলে মুক্তি-স্বাদ, অবন্ধন লোকে তুমি লভিবে নির্বাণ ?

মিথ্যা কথা ; তুমি নাই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মূঢ় এ কল্পনা—
প্রতারিত ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ মিথ্যা অনুভূতি ;
তুমি আছ, হে ভারত-হৃদয়-সম্রাট, আছ তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রাণে প্রাণে গানে গানে ছন্দে ছন্দে শতবন্ধে স্পন্দিত-হৃদয়ে
আছ তুমি আছ তুমি জড়াইয়া মরমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ লোকে আছ তুমি প্রাণবন্ত অমর অক্ষয়।

রবীন্দ্রনাথ

জীবনানন্দ দাশ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে,
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এ-রকম কথা যেন শোনা যেত কোনো একদিন ;
আজ সেই বক্তা ঢের দূর।

চলে গেছে মনে হয় তবু ;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে বলে
ওরা ভাবে লীন হয়ে গিয়েছে অন্তিমে ।

সৃষ্টির প্রথম নাদ—শিব-সৌন্দর্যের ;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়-তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে ।

রবীন্দ্র-স্মরণে

জ্যোতির্ময় ঘোষ

হে কবি ! তোমায় আজি স্মরি বার বার,
অন্তরের অন্ত হতে নমি শত বার ।
গিয়াছ চলিয়া ছাড়ি' এই মর্ত্যভূমি,
চিরদিন যারে ভাল বাসিয়াছ তুমি
আপন পরাণ সম । কাব্য, কথা, গানে
জীবনের প্রতি দিন, প্রতি বর্ষ, মাস
ভরিয়া তুলেছ তুমি মানবের মন
মধুর অমৃত রসে ! সত্য ও শাশ্বত,
সুন্দর, পবিত্র, শিব, দীপ্ত, কমনীয়,
যাহা কিছু আছে এই মানব-জীবনে
তোমার জাগ্রত মনে কল্পনার ছায়ে
বিকশি' উঠেছে তারা আকাশের গায়ে
লক্ষ চন্দ্র সম । তোমার লেখনী বাহি'

ঝরেছে অমৃত ধারা অবারিত স্রোতে
বিমুগ্ধ করেছে মন আশায়, আনন্দে !
শৈশবের তুচ্ছ খেলা, কৈশোরের মোহ,
যৌবনের কর্মরাশি, জ্ঞানের গরিমা,
বৃদ্ধের সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম-প্রয়াস,
তোমার বিরাট মনে, কল্পনার মন্ত্রে
সঞ্জীবিত, পল্লবিত, মঞ্জরিত আজ
অনন্ত ছন্দের মাঝে। জীবনের প্রতি
কর্ম, চিন্তা, দুঃখ, সুখ, ভ্রান্তি, সফলতা,
এঁকেছে তোমার মনে নিত্য স্পষ্ট ছবি
রঙিন স্বপন রাগে। উঠিয়াছে বাজি
অপূর্ব মোহন সুরে তোমার মনের
বীণাখানি। ভরিয়াছ আকাশ বাতাস
রবির কিরণ সম শুভ্র স্মিত রাগে
তোমার ছন্দের তালে, সুরের আবেশে।
চিরদিন রবে জাগি মানবের মনে
তোমার সুরের মন্ত্র, কল্পনা, সাধনা,
তোমার আশার বাণী। স্বপ্নে, জাগরণে,
শান্তির সুষুপ্তি মাঝে, অশান্তি-আবর্তে
তোমার অপূর্ব সুর বাজিবে নিয়ত
কালের প্রবাহ বাহি' মানবের প্রাণে।
তোমারে স্মরিয়া কবি অতি দীন মতি
শোকতপ্ত হৃদে আজ জানাই প্রণতি।

তোমাকে প্রণাম

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু তোমাকে প্রণাম—
আমরা তো ছোট ছোট সব,
ছোট ছোট আমাদের মন,
তোমার শিশির ফোঁটার মতো
আমরাও করি অনুভব,
সাধ নিয়ে অসহায় কতো ;
সাধ্য নেই তোমার কিরণ,
সবটুকু বুকে ধরে নেবো,
সব আলো নয়নাভিরাম—
কবিগুরু তোমাকে প্রণাম ॥

পঁচিশে বোশেখ এলো গেলো,
দিকে দিকে জয়ন্তী তোমার—
নাচ গান আবৃত্তির সুর
উন্মনা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ;
মনে হয় যেন কোথাকার
হাসিমুখে, কোন সিংহদ্বারে
তুমি ঐ, ধু ধু করে দূর,
চেয়ে আছো আমাদের দিকে—
করো বুঝি আমাদের নাম ?
কবিগুরু তোমাকে প্রণাম ॥

একদিন, আমাদের মতো,
ছিলে তুমি এতোটুকু কুঁড়ি,

তুমি আমাদের কবি

জসীম উদ্‌দীন

খুব বড় কবি হয়ত তুমি বা, আকাশের তারা আকাশের চাঁদ
হয়ত তুমি বা তাদেরই আপন কেহ ;
যতটা দূরেরে আমরা কেহই ধারণা করিনে
ততটা দূরেই হয়ত তোমার গেহ।

হয়ত চাঁদের খাটেতে ঘুমাও, শিশু তারাগুলি
তোমার সারাটি গায় ;
মণি-মাণিকের চূর্ণ ছড়ায়ে খেলা করে তারা উড়াল পূবাল বায়।
হয়ত পাখির পাখায় রঙিন সোনার তরণী ভাসাইয়া নীল জলে ;
মনের খেয়ালে গান গেয়ে যাও—যত দূর খুশি
তত দূরে যাও চলে।

এসব আমরা পারিনে বুঝিতে ভুল করে তাই আমাদের মাঝে
তোমারে ডাকিয়া আনি,
তুমি যেন কবি আমাদেরি কেহ মাঝে মাঝে তাই
তোমারে লইয়া করি মোরা টানাটানি।

তবু তুমি কবি—আমাদের কবি
আর আমাদের কথা,
—সে যে আমাদেরি—সেই গৌরবে তাই দিয়ে আজ
তোমার গলায় পরাই স্নেহের লতা।

দুঃখের রাতে কত যে কেঁদেছি
তোমার গানের সুরে সুরে বুক ফাঁড়ি,
শিয়রে প্রদীপ নিবিয়াছে তবু
তুমি যাও নাই ছাড়ি।

দরদী বন্ধু! জানি মোরা জানি তুমি বড় কবি
যতটা বড়রে ধারণা করিতে পারিনে আমরা কেহ,
তোমারে বলিতে আপনার জন সমান বয়সী
আজি উথলিছে সকল বুকের স্নেহ।

তুমি আমাদের, তোমার দুয়ারে
মাটির প্রদীপ রাখি,
আজ সাধ যায় সব বুক ভরি
তোমারে আমরা আমাদের বলি ডাকি।

স্মরণের কবি
প্রভাতকিরণ বসু

আমার ঘরের খোলা বাতায়ন তলে,
দখিন হাওয়ার মাতামাতি যবে চলে,
নব-মুকুলের মদির সুরভি আসে,
সকল ভোলানো কোনো ফাল্গুন মাসে,—
প্রদীপবিহীন শূন্য কক্ষ কোণে,
আমার কবিরে তখন পড়ে যে মনে!

তুমি চলে গেলে, ভাবিতে পারি না মনে
কে দিবে সুষমা প্রিয়ার নয়ন কোণে,
কে দিবে নূতন অশ্রুহাসির বাণী
মধুর করিতে বিষণ্ণ মনখানি
উৎসব দীপ নিভে যাবে কলরোলে
সে কি হতে পারে? তুমি কভু যাবে চলে!

যুগ যুগ যাবে তুমি রবে শুধু জেগে
বরষে বরষে সজল কাজল মেঘে
ধ্বনিয়া উঠিবে তোমারি প্রাণের কথা
বৈশাখী ঝড়ে উন্মাদ আকুলতা
শরতে, শিশিরে, বসন্ত-উৎসবে
নিত্য নূতন ছন্দে আপন হবে !
গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজার মত
হায় কবি, কথা তোমারে শুনাব কত
অগণিত তব বন্ধু মনের মাঝে
আমার এ ক্ষীণ সুর মিলাইবে লাজে।

রবীন্দ্রনাথ

সুকুমার সরকার

রবির তিয়াসা লয়ে অন্ধ ধরা ধ্যানে বসিয়াছে,
বৃক্ষ-বাহু উর্ধ্বে তুলি যুক্ত করে কাতর উচ্ছ্বাসে
জানায় প্রার্থনাখানি ; পল্লবের প্রতিটি কম্পনে,
তপস্যার স্তব মন্ত্র মর্মরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
ছায়া-চক্ষে মূক দৃষ্টি সিক্ত হল অশ্রুর শিশিরে
না-পাওয়ার শূন্যতায় ব্যোম-কক্ষ আছে ঘিরে ঘিরে।
জ্যোৎস্নার বসন নাই ; চন্দ্রসিঁথি মুছিয়া নিঃশেষে
রয়েছে দয়িত-হারা ; আলুথালু জলদের কেশে
আমূর্ছিত জীবনের তীব্র ব্যথা রূপ ধরে আজি
বৈরাগ্য-বিশুষ্ক কণ্ঠে নক্ষত্রের ফুল-মাল্যরাজি।

নিষ্প্রভ বিবর্ণ ম্লান ; নিঃশব্দ প্রাণের যত বাণী
অতল রহস্য হয়ে অন্ধকারে করে কানাকানি।
যে সূর্য স্বপ্নের পুরে বারে বারে শুধু তারি লাগি
চক্ষু তার দৃষ্টি চায় ; ব্যথা তার চায় মুক্ত ভাষা ;
কালো চক্ষে কালো বক্ষে কালো চুলে অদম্য পিপাসা
স্পর্শ চায় সুন্দরের ; পুঞ্জীভূত দৈন্য ক্ষোভ গ্লানি
সে দেবে মুছায়ে নিজে ; বর্ণের পবিত্র রেখা টানি
দেবে তারে নব রূপ ; অমৃতের পাত্র হাতে নিয়া
মরণ-পাণ্ডুর মুখে সন্তর্পণে ঢালিয়া ঢালিয়া
দেবে সঞ্জীবনী-সুধা ; উন্মুক্ত উদার বক্ষ 'পরে
যে তারে টানিয়া নেবে তার স্বচ্ছ আলোর নির্ঝরে ;
তারি লাগি কাঁদে ধরা, কাঁদে তার ঊর্ধ্বায়িত প্রীতি
দৃষ্টি নাই প্রাণ আছে গান নাই আছে মুগ্ধ-স্মৃতি।

রবি অস্ত যায়

বন্দে আলী মিয়া

রবি অস্ত যায়,
শ্রাবণের ম্লান আঁধার গগন কাঁদিতেছে বেদনায়।
তুমি আমাদের প্রাণের দেবতা ছিনু তব ছায়াতলে
তুমি নাই আজ এ কথা স্মরিয়া আঁখি ভরে আসে জলে।
যে জাতি আছিল চিরদিন হেয়—দীন ছিল ভাষা যার
জগৎ-সভায় সেই ভাষা দিয়ে লভিলে বিজয় হার।
পৃথিবীর তুমি শ্রেষ্ঠ মানব নিখিল-বিশ্ব-কবি
বঙ্গ জননী হয়েছে ধন্য তোমারে বক্ষে লভি।
সকল জাতিরে বেসেছিলে ভালো—সবার আপন তুমি
তাই বিদায়ের মহাক্ষণে দেব চরণ তোমার চুমি।

রবি অস্ত যায়,
নিভে যায় আলো—স্তব্ধ ধরণী শোকে করে হায় হায়।
চলে গেলে তুমি—রেখে গেলে হেথা অমর সিংহাসন
ধরণী তোমার উদয় অস্ত হবে না বিস্মরণ।
অক্ষয় তব মধু-ভাণ্ডার—শেষ নাই কভু তার
সকল যুগের জনগণ তরে মুক্ত তোমার দ্বার।
ফিরে এস দেব আমাদের মাঝে—ফিরে এস বাঙলায়
তোমারে হারায়ে আতুর জননী রয়েছে প্রতীক্ষায়।
বিদায় বেলায় অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়ে যাও তুমি কবি
রাত্রি প্রভাতে বাঙলার নভে উদিও নবীন রবি।

২২শে শ্রাবণ
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শেলীর রাত্রি ঃ প্রাচী-র আঁধার গর্ভগুহায় থাকে
ধূসর-নিচোল তারকাঞ্চিত। দিনের আনন চুমি'
সূর্যেরে করে পাণ্ডুরপ্রভ ঃ রভসে মূর্ছা আনে,
আবার এসেছে শীতলস্পর্শ মৃত্যুসোদর সাথে।

যে প্রাচী নিত্য নীল অঙ্গন করেছে উদ্ভাসিত
যে রবিরশ্মি জড় চেতনারে অভিরঞ্জিত করে,
সে রবি বিলয়ে প্রাণেরই প্রলয় ঃ প্রতীচী অস্তরাগ
শুধিছে প্রথম জীবনের দেনা নিগূঢ় ব্যঞ্জনায়।

বার বার ছলি' লীলাসঙ্গিনী নিয়ে গেল দিনমণি,
ফেলে গেছে পিছে সুরবন্ধন সপ্তজ্যোতির মালা।
নিখিল-মানস-সম্ভূত রূপ মর্ত্যে উধাও হল—
তাল-রোমাঞ্চ গেরুয়া মাটিতে, উপমা-শিহর তায়।

সূর্য-স্বপ্ন

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সৃষ্টির গোপন তূণে বিনষ্টির মৃত্যুবাণও থাকে :
তোমার তূণীর হ'তে প্রতিবার পঁচিশে বৈশাখে
পুষ্প-পুচ্ছ বিষ-মুখ সেই তীর করেছি প্রার্থনা :
অমৃতের বর ছেড়ে সুখ-মৃত্যু করেছি ভজনা।

তুচ্ছের উঞ্ছতা নিয়ে প্রত্যহের লঘু সপ্তপদী
কামনার কাচঘরে রোমাঞ্চের রসালো ধ্রুপদী।
বিলাসের পঙ্ক-শয্যা, ক্লেদ-কণ্ঠে ভোগের বিকার
আজীবন তুমি যারে মৃত্যু বলে হেনেছ ধিক্কার।

তাইতে হয়েছি লুব্ধ ! পাশুপত পড়ে আছে তূণে :
সাধ নেই, সাধ্য নেই, হাত দিই তাহার আগুনে।
ভুলে গেছি শক্তি-মন্ত্র জন্মেজয় জীবনের ভাষা,
ব্যর্থ তাই সূর্য-স্বপ্ন, দিক্‌চক্রে নেমেছে নিরাশা।

শিয়রে তামসী রাত্রি : অচেতন আত্মার আকাশ :
মানুষে দেবতা নেই, নরমুখ পশুরই প্রকাশ।
তোমার সে অগ্নি-সত্তা প্রত্যয়ের নির্ভর স্খলিত
বিভ্রমের স্বপ্নভঙ্গে জীবনের সত্যে উপনীত।

হেলায় নিশ্চিহ্ন করে বিশ্বাসের জীর্ণ জাদুঘর
লক্ষ্মীরে দু'পায়ে ঠেলে, নিতে পারে অলক্ষ্মীর বর :
ঈশ্বরের শান্তি-স্বর্গে কান পেতে শোনে বিশ্ব-ত্রাস
দানবের হুহুঙ্কারে নাগিনীর আগ্নেয় নিঃশ্বাস।

মৃত্যুপণ প্রতিরোধে বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়ে যায়,
পৌঁছিতে পারিনি মোরা তোমার সে দুর্লভ সত্তায়।
আমরা মৃত্যুর প্রজা। স্থান নেই তোমার আকাশে
বৃহন্নলা জীবনের শব নিয়ে চলেছি উল্লাসে—

মৃত্যুরই খাজনা দিতে। চোখ-ভরা পাতাল-পিপাসা :
এত সূর্য—এত আলো—নবজন্ম তথাপি দুরাশা।

আবার আসিবে ফিরে

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে—"
এই যে শাশ্বত সত্য তাহা তুমি করেছ প্রত্যয়
আপন মৃত্যুর মাঝে, হে কবি, হে ঋষি মহীয়ান!
তাই বুঝি গেলে চলে ফেলে রেখে যা কিছু সঞ্চয়;
ধুলার ধরণী হতে শুনিয়াছ তারার আহ্বান।
মৃত্যুরে দেখেছ তুমি কভু বন্ধু কভু শ্যামরূপে;
লেখনীর তুলি দিয়ে আঁকিয়াছ তার চারু ছবি;
শ্যামের মোহন বাঁশী শুনে বুঝি তাই চুপে চুপে
অভিসারে বাহিরিলে রাধিকার মতো তুমি কবি!

আবার আসিবে ফিরে; বেণুবনে জাগিবে কম্পন,
শ্রাবণ-গগন রবে চেয়ে তব নয়নের পানে,
কদম-শাখায় শিখী মহানন্দে করিবে নর্তন,
প্রিয় লাগি' বিরহিণী সারা নিশি পোহাইবে গানে।

আবার আসিবে ফিরে—এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস;
তোমার লাগিয়া কাঁদে পৃথিবীর আকাশ বাতাস॥

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু
উমা দেবী

পৃথিবীর দুই সীমা উত্তর দক্ষিণ—উত্তরে প্রশান্ত নীল মানস-সাগর,
দক্ষিণে ধূসরস্রোতা বহে স্রোতস্বতী। যোগ নেই কিছু।
উত্তরে উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গে চূড়ায় চূড়ায়
বরফের শ্বেতদীপ্তি ঝলকায় রৌদ্র আভা লেগে;
তপ্ত রৌদ্র-রেণু সেও হিম হয়ে আসে তুহিনের হিমেল পরশে!
কূলে কূলে প্রসারিত নিস্তরঙ্গ জলে
আকাশের শ্বাস যেন ধুঁকিছে ধোঁয়ায়—
জরাহীন মৃত্যুহীন স্পন্দহীন জীবন সেথায়
বেগহীন নিঃসাড় শীতল—
জীবন—তবু সে নয় জীবনের মত। সৃষ্টি সুপ্তিলীন।

দক্ষিণের স্রোতস্বিনী তরঙ্গচঞ্চল—
একূল ওকূল ভাঙি করে টলমল,
চূর্ণ হয়ে ফেনারাশি আকাশে ছড়ায় ঘূর্ণির দুরন্ত বেগে।
উৎপাটিত তরুমূল গৃহশিশু পোষ্য খাদ্যভার—
ভেসে যায় দুরন্ত প্রবাহে।
তরঙ্গে জড়ায় এসে দূষিত জঞ্জাল,
মন্দীভূত স্রোতোজলে দুর্বার আবেগ
ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসে দিনে দিনে
বহে স্রোত মৃতপ্রাণ। সেথায় চাঞ্চল্য আছে ক্ষীণ জীবনের
হৃতবেগ বিষাক্ত প্রবাহ—
জীবন—তবু সে নহে জীবনের মত। সৃষ্টি ছিন্নমূল।

মানস-সাগর—কূলে কূলে প্রসারিত স্থির স্বচ্ছ জল,
চঞ্চলতা জাগে কি সেথায়?

পবনে তরঙ্গ জাগে অতিসূক্ষ্ম সুরের আঘাতে
আকাশে ধ্বনিত হয় সুর-শিহরণ—
হিম পাণ্ডু সূর্যালোক চমকিয়া ওঠে, স্পর্শ পায় নব-জীবনের।
জমাট বরফরাশি গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গলে যায় সুরের পরশে।

মানসবিহারী হংস—প্রসারিত হেমবর্ণ পক্ষ ছুটি তার,
নীল জলে সলিল বিহার,
স্ফুট চঞ্চুপুটে জাগে অপূর্ব মূর্ছনা অপরূপ সঙ্গীতের।
সুরে সুরে ফুটে ওঠে সোনার কমল
মানসের নীল বুকে।
কোথা থেকে আসে ভৃঙ্গদল—
শুরু হয় মধুলোভে ঘন গুঞ্জরন। সে সুরের শিহরণ
পৌঁছায় আকাশে যেন তারায় তারায়,
হিমগলা উৎস জলে জাগে জীবনের
নবতর চঞ্চল স্পন্দন। মূর্ত হয় অমূর্ত বিলাস।
নেমে আসে স্রোতোধারা পৃথিবীর ঊষর প্রান্তরে
রুদ্ধ উৎসমুল মুক্ত হয়।

নেমে আসে রাজহংস মানসবিলাসী—
ধূসর জলের স্রোত মৃতের মতন যেখানে পড়িয়া আছে।
সুরে সুরে জাগে উন্মাদনা,
আলোক খসিয়া পড়ে তরঙ্গ-চূড়ায়
অপূর্ব হিল্লোল ভরে।
যাহা কিছু হীন জড় জীবন-বিহীন
অগ্নির স্পর্শনে যেন হয় ভস্মশেষ—সে অগ্নি সুরের জানি।
গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল জাগে দুই তীরে—
পৃথিবীর পরিতুষ্ট প্রসন্নতা যেন।

প্রান্তরে সোনার বর্ণ ধান্যের সম্ভার ধরণীর সাফল্য-সম্পদ।
—যোগ হয় উত্তরে দক্ষিণে। উন্মুক্ত উৎসের মুল—বহে
স্রোতোধারা।

তারপরে একদিন—বৃষ্টিশেষে নীলাকাশ রৌদ্র-ঝলমল,
সদ্যঃস্নাত খণ্ডমেঘ ভেসে ভেসে যায়
নিকট দক্ষিণ হতে সুদূর উত্তরে—হংসমন বিবাগী চঞ্চল।
দক্ষিণের মধুময় প্রণয়-বন্ধন মর্মস্থলে জাগায় বেদনা,
তবু উত্তরের প্রীতি করে উচাটন—উত্তরের অপূর্ব চেতনা।

প্রসারিত হেমপক্ষ নীলকান্তি আকাশের বুকে
রাজহংস দিল পাড়ি।
সুরের মৃণালখণ্ড ভেঙে ভেঙে পড়ে—
চরাচর মৌন ম্লান আনন্দে বিরহে।
অবসন্ন দিগন্তের পাণ্ডুর আলোয় কোথা থেকে নামে ছায়া—
আকাশের মর্মস্থল করে নিপীড়ন,
রক্তবর্ণ সূর্য ভয়ে কালো হয়ে আসে,
বাতাসের উন্মত্ত নর্তন।—চোখে মুখে লাগে ঝড়।
পাখার পালক—ছিঁড়ে খসে ভেসে যায় বায়ুর প্রবাহে,
হেমবর্ণ পক্ষপ্রভা অন্ধ অন্ধকারে গহন মরণ লভে।
স্ফুট চঞ্চুপুটে তবু সুর-মূর্ছনায়
ম্রিয়মাণ আলোকের জাগে সম্ভাবনা—
সুর যায় সুদূর উত্তরে, দেহ-স্পর্শ পায় শুধু দরদী দক্ষিণ।

দক্ষিণ উত্তর—
পৃথিবীর দুই সীমা দুর—বহুদুর,
বহুদুর তবু জানি নাই বিচ্ছিন্নতা—
স্রষ্টা ও সৃজন একাকার।

২২শে শ্রাবণ

বিষ্ণু দে

আনন্দে নিশ্বাস টানি, হৃৎস্পন্দে আশার আশ্বাস
শুনে আসা দীর্ঘকাল অভ্যাস, তবুও
হঠাৎ হাওয়ায় আসে উপবাসী মানুষের রোদনের ছুয়ো,
কেটে যায় বীটোফেনী সিম্‌ফনির গন্ধর্ব বাতাস।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,
অলখ সঙ্গীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয়
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে।

নিসর্গ বেসেছি ভালো নীল ঢেউ-এ পাহাড়ে তুষারে
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেলো আমার শহর,
নিদ্রাহীন তাই আজ আমার সে স্বপ্নের প্রহর
মুষ্টি হানে কীটদষ্ট কূটরাষ্ট্র বাণিজ্যভূষারে।

আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুস্থের মিছিল,
আমার মুক্তির স্বাদ জানেনাকো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

নেকড়ের হন্যেয় দেশ, ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা !
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
মানুষ দুর্জয় ॥

কবি-প্রণাম

সুকোমল বসু

একটি প্রসন্ন প্রাতে যাত্রা শুরু গানের পাখীর !
শুধু পক্ষ-আন্দোলন, গানে গানে মগ্ন আত্মহারা
আলোর তৃষায় শুধু উড়ে-চলা আর গান-গাওয়া
অসীমের হাতছানি ঃ নৈর্ব্যক্তিক রূপের ইশারা !

স্বর্ণ-গর্ভ শরতের বিচ্ছুরিত হাসির জোয়ারে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রাবৃটের কান্না-ভরা, আলো-মোছা রাতে
একই সে অব্যক্ত রূপ তর্জনীতে দিয়েছে নির্দেশ ঃ
শুধু উড়ে-চলা আর গান-গাওয়া মর্মের সংঘাতে !

কত দেশে গেলে উড়ে—ভ'রে দিলে কত সে অন্তর
তোমার অশ্রান্ত পক্ষ বিরতির খোঁজেনি আরাম
যাত্রা-শেষে স্বর্ণ-সৌধ-শীর্ষ 'পরে উড়ে বুঝি এলে তারপর !
তারপর অবকাশ পেলে বুঝি শান্তি-নীড়ে চির-বিশ্রাম !

তোমার সে গান বাজে আমার এ অন্তর-গভীরে
এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু মিশালাম স্মৃতি-তীর্থ-নীরে !

রবীন্দ্র-শরণ

জগদীশ ভট্টাচার্য

আজ পাশে কেহ নাই, একা আমি কৃষ্ণপক্ষ রাতে—
প্রাণের দোসর যারা আজ সব রহিয়াছে দূরে,
অন্ধ অন্ধকার মাঝে হারাইনু অন্তর-বঁধুরে ;
নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে রাত্রি জাগি রিক্ত নিরালাতে।

হে কবি

অজিতকৃষ্ণ বসু

হে কবি,
এপারের প্রণাম লহ ওপার হতে
মরমের কুসুম ঝরে হায়
ভেসে যায় গানের স্রোতে।

জীবনের খেলার শেষে বিদায় বেলায়
যে বাঁশী গেছ ফেলে অবহেলায়
সে যে হায় তোমার তরে কেঁদে মরে
ধরণীর ধূসর পথে।

ফিরে এস আবার কবি
সে বাঁশী তুলে নিতে
আলো আর ছায়ায় ঘেরা
এ ধূলার ধরণীতে।

হেথা যে রবি-হারা আঁধার নিশা
তিমিরে হারাই দিশা
করো দূর আঁধার কালো জ্বালিয়ে আলো
প্রভাতের অরুণ রথে।

অমৃতযোগ

বিমল মিত্র

আকাশের খোলা রোদে খেলা করে খেলা করে
সাত রঙা পাখার পালক।
মনে হয় সব আছে। তুমি আছ, আমি আছি
আর আছে এ অমৃতলোক!

আজি হতে শত বর্ষ আগে
বেদনায় বন্দনায় মুগ্ধ অনুরাগে
একটি পবিত্র নাম জন্ম নিল মানুষের ঘরে
বৈশাখের আতপ্ত প্রহরে।
কেহ বলে—শুভলগ্ন। কেহ বলে—না না—
তর্ক ওঠে নানা!

অবিশ্বাস-বিলাসী মানুষ। কোথায় সান্ত্বনা!
বন্ধন-শৃঙ্খল তার চরম যন্ত্রণা হানে।
কত রাত্রি-দিন
মিথ্যা দিয়ে মৃত্যু দিয়ে তাই
বার বার যন্ত্রণার দুর্গতি বাড়াই।

সংশয় সংক্ষুব্ধ মন—আমরা মানুষ।
কেহ বলি—শাশ্বত যে মৃত্যুর আহ্বান। মৃত্যুকে
কে করে অস্বীকার?
কেহ বলি—মিথ্যা কথা, জীবনেরই জয়-জয়কার।
তর্ক বাড়ে। ক্ষুব্ধ হয় দ্বন্দ্বের কুজ্ঝটি।
মৃত্যুর ভ্রূকুটি
প্রাণে তোলে শঙ্কার উদ্রেক।

তারপর
অনেক তর্কের শেষে কেটে গেলে অনেক প্রহর
অবশেষে
নানা দৈন্য, নানা ত্রাস, নানা লজ্জা কাটায়ে অক্লেশে
তুমি এলে হে অবিনশ্বর,
শান্ত হল ঝড়।
জীবনের হল অভিষেক।

মনে হল—মৃত্যু সে তো মৃত্যু নয় আর।
মানুষেরই পাপ আর মানুষেরই অন্ধ অত্যাচার
মৃত্যু হয়ে দিকে দিকে বাড়ায় সন্ত্রাস
বারো মাস।
মনে হল—সকলের উর্ধ্বে যাহা শ্রেষ্ঠ রাজযোগ
—সে অমৃতযোগ।

তাই আজ আকাশের খোলা রোদে খেলা করে,
খেলা করে সাত রঙা পাখার পালক।
মনে হয় সব আছে। তুমি আছ, আমি আছি
আর আছে এ অমৃতলোক ॥

বাইশে শ্রাবণ
দিনেশ দাস

কান্নার করুণ মেঘ আকাশে ঘনায়।
সূর্যের সিঁদুর-টিপ, তারার মটরমালা
লুকাল কোথায়!
মেঘের সমুদ্র কোলে :

আলো নেই, শূন্য দীপদান—
কোন্ আলো দেবে বলো আমাদের পথের সন্ধান ?

একটি একটি করে অনেক বছর হল শেষ
শুধু জমে ঘৃণা, ভয়। সহস্র বিদ্বেষ
আমাদের পাকে পাকে বেড়ে ধরে,
জীবনের পুজোর প্রসাদে নিত্য ধুলো পড়ে।

আকাশ-পৃথিবী জুড়ে কী এক অদ্ভুত
বিয়োগান্ত নাটকের কালো যবনিকা :
ধোঁায়া-বৃষ্টি হয় চারিধারে।
তবু এই ধোঁায়াভরা মেঘের ওপারে
জাগে এক স্থির বিদ্যুৎ—
বজ্রগর্ভ আলোকের শিখা।

সে-আলোয় তোমারই তো নাম—
তোমারই নামেতে দেখি আলো হয়।
অন্ধকার ঝ'রে পড়ে কালো-কালো টুসটুসে আঙুরের মত,
ঝ'রে পড়ে যত মিথ্যা ভয় ;
আলো হয়, দিন হয়।
তোমার বৈশাখী আলো
শুভ্র স্ফটিকের মত জ্বলে
জলে, স্থলে,
সমুদ্রে, আকাশে, শালবনে :
বাইশে শ্রাবণে।

রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ফেনিল সমুদ্র দেখি
আর দেখি তারকাখচিত নীল রাত্রির
আকাশ
তোমার কাব্যেরে মনে পড়ে।

তারার তরঙ্গে ভরা সুধাক্ষরা
অনন্ত অক্ষরা
তোমার ও কবিতা জানি
কভু স্তব্ধ কভু কলস্বরা
এই পাই, এই তার পাইনাকো সীমা
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি
অপার মহিমা।

তবু তো সীমাহীন অনন্ত আকাশে
ছোট মোর অবকাশ ভরি'
একান্ত আপন করি'
তবু তো কখনো পাই তাকে
শিকে ঘেরা জানালার ফাঁকে।

সুনীল সিন্ধুরে ছুঁই,
দুই হাতে অঞ্জলি ভরিয়া তুলি জল
আনন্দে উচ্ছল চিত্ত
অশ্রুভারে চক্ষু ছলছল॥

স্মরণে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে এতোদিন দেখেছি স্বর্ণস্বাক্ষরে
এখনো দেখছি চাঁদ-সূর্যের রৌদ্রে
শরতের রোমাঞ্চিত কাশবনে
কৃষ্ণচূড়ার লাল অরণ্যে।

তুমি তো সৃষ্টি করেছো এই পৃথিবী
যেখানে বৃষ্টি পড়ে, আকাশ নীল,
সৃষ্টি করেছো জীবন
ভরেছো দূরবনগন্ধ আবেশ ;
এখানে সূর্য অস্ত গেলো, সূর্যদেব কোন দেশে ?

এতোদিনে তোমাকে চিনলুম, তবু চিনলুম না ;
সূর্যের মতো নিঃশব্দ অথচ বিরাট।
এই তো পৃথিবী
আকাশ আর সমুদ্র
পাহাড় আর অরণ্য
সবুজ ছায়ায় হরিণ হাই তুললো
একটি তারা কোনো মেয়ের চোখে কাঁপলো

তুমি চলে গেছো, রেখে গেছো এদের,
আমি যখন চলে যাবো কী নিয়ে বাঁচবো।

শ্রাবণে-বৈশাখে
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বাইশে শ্রাবণ হতে নিরন্তর পঁচিশে বৈশাখে
জীবন আপন ছবি এঁকে চলে। দৃশ্যের গভীরে
বিকীর্ণ স্পন্দনে দানে সজ্জিত স্তবকে শাখে-শাখে
অনন্য জীবন-বেগ ; উৎস পূর্ণ অম্লান নির্ঝরে।
সংসারে উদ্বেগ বহু, অন্ধকার ভঙ্গীগুলো যত
ভাঙে আকাঙ্ক্ষার সেতু, আনে শোক, অপ্রেমের মোহ ;
সকরুণ আর্তি যেন শ্রাবণের ধারায় নিহিত,
পৃথিবী একটি দ্বীপ, উদ্বেগের ঢেউ ইতস্ততঃ।

সৃষ্টির বিরল দৃশ্যে রম্যতায় শোভন ভবন,
সেখানে বঞ্চনাহীন প্রীতিরসে সিঞ্চিত হৃদয়
শান্তি পায় ; রবীন্দ্র-প্রতিভূ এক অনন্ত যৌবন
চিত্রশালে রেখে যায় সম্মানিত রঙের সঞ্চয়।

বাইশে শ্রাবণে শ্রান্তি ; পঁচিশে বৈশাখে পুনরায়
স্বর্ণঘট পূর্ণ ক'রে প্রাণ বাঁচে অমৃতধারায়॥

কবিকে জিজ্ঞাসা
বাণী রায়

বৈশাখে বালার্ক যদি খুললো দু'চোখ
মনের কিংশুক-তীরে ; অশোকের তীরে
বিদ্ধ কোন বৃদ্ধসত্তা ; জরতীর জরা
ঝরে গেল, খসে গেল,—বিচ্যুত পল্লব।

দিনান্তের শব
দেখলো তপনশৃঙ্গে সেই খোলা চোখ।
গভীর আয়াসমগ্ন জটিল হৃদয়
এখনও কবোষ্ণ কাঁপে।
সেই বা কি পেল ?
শুক্রাচার্য শাপে
যযাতির ক্ষিন্ন জরা খসে যদি গেল,
—কি বা সে দেখল, বল ?
দেখল অনন্ত—
অন্ত হল অবসান।
বিষাদবিকীর্ণ এমন মনের বোঝা
নেবে নাকি, কবি ?
অবক্ষয়-চূর্ণকরা গানেতে তোমার,
আমার আশ্রয় আছে ?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

মণীন্দ্র রায়

আকাশে জমেছে মেঘ,
তবু দেখি একটি কি দুটি তারা আজো
জেগে আছে স্মৃতির চূড়ায়।
তেপান্তর অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তাই
কেবলই হৃদয় খুঁজি, কেবলই মানুষ—
যার হাত হাতে নেওয়া যায়।

ক্লান্তি আজ পায়ে পায়ে। মনের পাতালে
যতোবার নেমে তুলি পিপাসার জল,
ঝরে যায় আঙুলের ফাঁকে।
এ কোন দানবী আজ মোহিনী মায়ায়
হেসে হেসে আগুনের নদীর ওপারে
বারে বারে ডাকে !

হে মমতা, জীবনের স্নিগ্ধ জ্যোতিকণা,
তবু যে যাইনি মুছে, শস্যের স্বপ্নের
পরমাণু নিয়ে আজো বাঁচি—
সে তোমারই ভালোবাসা, তোমারই আলোয়
আমার দু'চোখে জ্বেলে তারার প্রদীপ
আজো জেগে আছি ॥

রবীন্দ্রনাথ

বিমল দত্ত

আকাশে তারার জ্যোতি
ঝিকিমিকি অক্ষরের আর
জ্বলে না প্রদীপ্ত সূর্য আর
ভারতের দীপ্ত সূর্য
হে রবীন্দ্র লহ লহ
অযুত অযুত নমস্কার—
উদয় শিখর হতে অস্তগিরি
দীর্ঘ পথ করি পরিক্রম
আলোয় বন্যায় প্লাবি

পূর্ণ করি নিখিল ভুবন
চলে গেছ তুমি আজ—
অনন্ত পথের পান্থ
লঙ্ঘি কাল, লঙ্ঘি দিক্ দেশ
শ্রদ্ধায় আভূমি নত আজি তব
আপন স্বদেশ
বারংবার পুজে তোমা :
মহাপুণ্য দিন তাই পঁচিশে বৈশাখ
তোমারে বরণ করি হল আজ চিরস্মরণীয়
বিশ্বের বিস্ময় তুমি
বিশ্বকবি বিশ্ব-বরণীয় ।

মৃত্যুঞ্জয়
রাণা বসু

তোমার মৃত্যুকে আমি করি না স্বীকার ।
তোমার দেহের মৃত্যু কখনো তোমার মৃত্যু নয়—
এই বাণী নিয়ে আসে পঁচিশে বৈশাখ ॥

মানুষের জয় গেয়ে, পরিয়েছ মালা :
শতাব্দীর সূর্যরূপে
ফুলে ফুলে ঢেলে গেছ অমৃত-মদিরা ।
কলের-পুতুল আমরা তাই পান করে,
কর্মক্লান্ত জীবনেতে
পাই নব স্নিগ্ধতার স্বাদ ॥

তোমার নানান লেখা অমর অক্ষরে
কীর্তিস্তম্ভরূপে তারা রইবে সজাগ
শুভ্রতার মাঝে।
হাজার বছর পরে
জল ঝড় সয়ে সয়ে হয়তো বা ক্ষয়ে যাবে
শ্বেত হিমালয়,
তখনো তোমার লেখা
পূর্ণ তেজে বেঁচে রবে অজানার কালে
জ্বেলে দেবে নব দীপ
সেদিনের মানুষের ঘরে,
স্তব্ধ চোখে, সমুদ্র-পাহাড়-নদী
জানাবে তোমার পায়ে
প্রাণের প্রণাম ঃ
চিরজীবী তুমি কবি, মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রের নাম ॥

মৃত্যুহীন

বিভা সরকার

তুমি নাই হায় কবি এ যে নিদারুণ
অনাথিনী ধরণীর রোদন করুণ
দিকে দিকে দিশাহারা ঐ যায় শোনা
কাহার ধেয়ানে হলে তুমি অন্যমনা !
হে অমর্ত্য রেখে গেলে মৃত্যুহীন প্রাণ
অনন্ত আনন্দ আনি করি গেলে দান।
গানে গানে ওগো কবি বিশ্ব দিলে ভরি
কবিতা-অর্ণবে ভাসে তব পূর্ণ তরী।

অথৈ গভীর জলজয়ী কর্ণধার
বঙ্গভাষা পারাপার হয়ে গেছো পার।

তোমার পরম দানে কোন সীমা নাই
জনম ভিখারী মোরা তবু আরও চাই।

আকণ্ঠ ভরিয়া লয়ে অমরার ধন
সাগরে করিতে চাই কেবলই মন্থন।

মন্দাকিনী প্রেমধারা এনে সাথে করি
পরম ঐশ্বর্যে দিলে বসুন্ধরা ভরি।

তোমা বিনা ধরণী যে হল প্রাণহীনা
বীণাপাণি করপদ্মে কাঁদে আজ বীণা।

প্রমত্ত মাতনে ডাকে উতলা বৈশাখ
গ্রামান্ত কুটীরে তোমা ডাকে সন্ধ্যা-শাঁখ।

বর্ষার বেদনা জাগে বৃষ্টির নূপুরে
রাখালের বেণু ডাকে বিরহীর সুরে।

কদম্ব কেশর ম্লান কবি কোথা বলি
পদ্মার জলধি কাঁদে উথলি উছলি।

শূন্য শান্তিনিকেতন কাঁদিছে কোপাই
মন্দির পড়িয়া আছে দেবতা সে নাই!

উত্তরায়ণ শূন্য কবির প্রয়াণে
বিশ্বের বেদন জাগে গুমরি গোপনে।

তোমা বিনা শরতের কাঁদে আলোছায়া
কাঁদিয়া তোমায় ডাকে বনান্তের মায়া।

হেমন্তে শিশিরকণা ফেলে অশ্রুজল
তোমারে স্মরিয়া চিত্ত হয়েছে উতল।

নিঠুর দরদী শীত ডাকিছে তোমায়
ছয় ঋতু কেঁদে বলে হে কবি কোথায় !

পূরবীর ছন্দে কাঁদে গোধূলির ছায়া
কিংশুক কোরকে কাঁদে বসন্তের মায়া।

প্রভাতে ছাতিম ছায়ে নাই যোগীবর
দিনান্তে একান্তে কাঁদে উদাসী প্রান্তর।

মধ্যাহ্নে হলে কি ম্লান প্রভাতের রবি
মহামগ্ন কোন ধ্যানে ওগো বিশ্বকবি।

জগৎ পূজিত তুমি চির বরণীয়
ফিরে এস আরবার আকৃতি ক্ষমিও !

রবীন্দ্রনাথের ছবি

আনন্দ বাগচী

'আধেক ছায়ায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয় পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপ্‌সা কালির নয় সে পরিষ্কার
সুখ দুঃখের ভাঙা বেড়ার সমান যে দুই ধার।'

এই যে দারুণ বন : দারুময় বন কার অদৃশ্য কুঠারে
শৃঙ্গার চিহ্নিত প্রতিরাত্রে, এই মৃত্যু এই শব
যমুনা নঈকূলে কার বাঁশি বাজে অতর্কিত ঠারে
কিংবা মন-মাঝে কিংবা নিশ্ছিদ্র নীরব
নিদ্রার অতল স্তরে, নয় শুধু ছবি এই অরণ্যে রোদন,
হয়ত বিগত ভাষ্য নির্ঝরের ক্লান্ত দুঃস্বপন।

হয়ত ভূগোল-গোলা-গল্পে যার শুরু তার শেষ
ভঙ্গুর বর্ণিকাভঙ্গে দীপ্তচক্ষু নটীর নূপুরে,
মৃত্তিকার ত্বকে ত্বকে হয়ত প্রচ্ছন্নতম শ্লেষ
শোণিত-শাসিত হয়ে বাজে আজ বন্য অশ্বক্ষুরে।
যা ছিল অক্ষরবৃত্তে উন্মীলিত সুচারু গোলাপ
তার অধঃদেশে জ্বলছে ঋজুরেখ কন্টকের জ্বালা।
উদ্ভিন্ন পৌরুষ ভুগছে অন্ধকারে যক্ষ-মনস্তাপ
অলৌকিক পটে খেলছে বিসর্পিল রৌদ্রের নিরালা।

অতিপ্রান্ত জুড়ে শুধু রেখা, তীক্ষ্ণ আত্মঘাতী রেখা ॥

তোমার শতাব্দী ভেঙে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নিকটে অনেক দূরে, ঝরে যায় বয়সের শেষ স্বাধীনতা।
আমি বেঁচে আছি কিংবা নেই—এ দাবী প্রধান কণ্ঠে জানি একদিন
প্রশ্ন হয়ে ছুঁয়ে যাবে প্রতি শব্দ, ধ্বনির জিজ্ঞাসা ;
বছর বছর পরে কোন একদিন।

যে বিকাশ আন্দোলিত আজ ওই অনিশ্চিত ফুলে
আমি তার প্রতিবিম্বে সমস্ত আকাশ ডেকে আনি ;
ডেকে আনি, কেননা এখন এই আপাতত দৃশ্যের শরীরে
যত প্রিয় স্পর্ধা ভাবি সব ভাসে দক্ষিণ হাওয়ায়।
একদা কৈশোরবেলা প্রবল বিক্ষোভে আমি একা
প্রথম পাখীর ডাক, নক্ষত্রের তৃষ্ণা চিনে নিতে,
তোমার শতাব্দী ভেঙে অকস্মাৎ চতুর্দিক আলোর বন্যায়
আমার যৌবন আমি দেখেছি ছায়ায় কাঁপে তোমারি অসীমে।

আজ পৃথিবীর এই অর্থহীন মর্যাদার পাপে
অন্ধতম অবনত মানবিকতার অভিশাপে
নিহত প্রেমিক আমি যত শব্দ লিখি-ঝরে কবিতার তীর্থ সরে যায় ;
পারিনা তখনো যেতে যুগের সংঘাত ভুলে অন্য কোন অনন্য আশ্রয়ে।
হে অমলিন রৌদ্র ! তুমি তবু দিগন্তের নির্ণিমেষ নীলে
কি অমোঘ জেগে আছো সমস্ত শূন্যতাজয়ী স্বরাট একাকী,
যেন বাংলাদেশ, যেন সময়ের সাধ্যপার হতে
সমস্ত নিখিল জানে কত দীর্ঘ ধ্যান এই সূর্যের অনন্য জ্বলে ওঠা,
একদিন
বছর বছর পরে কোন একদিন।
আমার প্রথম জন্মে রবীন্দ্রনাথের অধিকার
আমার যথার্থ মৃত্যু—তোমাকে ভোলায় দুঃখ যদি ভুলে যাই।

শতবর্ষ পরে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

তুমি আজ নাম মাত্র, পটে লিখা ছবি, সত্য নও,
সত্য নও আমাদের চেতনায়, সত্তায়, রক্তের
প্রদেশে বিদেশী তুমি আজো, ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের
ধ্রুপদী আলোয় যেন অনাত্মীয় গূঢ় কথা কও,
সেই কথা শোনে পোড়ো জমি, তার মৌরুসীভোগীরা
তোমাকে নির্লজ্জ পড়ে—ক্রান্তপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রসংহিতা,
হিমাদ্রিকে মাপে তারা নিয়ে যেন মূঢ় গজ ফিতা,
কিংবা হিমাদ্রিকে পার হবে ভাবে পঙ্গু ভারতীয়া।

নাম তুমি ছবি তুমি স্মৃতি তুমি হুজুগী সভায়
গন্ধে ধূপে মাল্যে আর সর্বজ্ঞের বিবর্ণ ভাষণে,
সত্য, সবই সত্য ;
তবু আসবে তুমি ভাবি অন্য মনে
এই পোড়ো জমি ভেঙে অন্যতর সকালবেলায়
ঘরভরা শূন্যতা সরিয়ে, দীপ্ত পূর্ণ ;
কিন্তু কবে ?

দ্বিতীয় ভারতবর্ষে দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে ॥